হ্যান্ডবুক

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব

Oxfam

Network for Information, Response And Preparedness Activities on Disaster
nirapad

অক্সফাম, একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংগঠন বাংলাদেশে কাজ করছে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় থেকে। পরবর্তীতে বাংলাদেশের প্রায় সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ পরবর্তী জরুরি অবস্থায় অক্সফাম সাড়া প্রদান করে আসছে। সমন্বিত মানবিক সহায়তা এবং দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়ন কার্যক্রমের মাধ্যমে দরিদ্র এবং বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর কষ্ট লাঘবে অক্সফাম অঙ্গীকারাবদ্ধ। এ উদ্দেশ্যে অক্সফাম বিভিন্ন বিশ্বমান সম্পন্ন গবেষণা, নীতিমালা, নানাবিধ প্রোগ্রাম এবং এ্যাডভোকেসি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

আরো তথ্যের জন্য ভিজিট করুন-
http://www.oxfam.org.uk

অথবা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-
অক্সফাম-জিবি, বাংলাদেশ
বাড়ি- ৪, রোড- ৩, ব্লক- আই
বনানী, ঢাকা- ১২১৩, বাংলাদেশ।

নেটওয়ার্ক ফর ইনফরমেশন রেসপন্স এন্ড প্রিপেয়ার্ডনেস এ্যাকটিভিটিজ অন ডিজাস্টার (নিরাপদ) বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য দুর্যোগ বিষয়ক নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্কটি জ্ঞান ব্যবস্থাপনা, সামর্থ্যের উন্নয়ন এবং মানবিক এ্যাডভোকেসি ইস্যুতে কাজ করছে। নিরাপদের মিশন হলো, 'একটি কার্যকর, দক্ষ নেটওয়ার্ক এবং রিসোর্স সেন্টার হিসাবে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় তথ্য, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সক্ষম সংস্থা ও পেশাদারিত্ব তৈরিতে সহায়তা করা'।

আরো তথ্যের জন্য ভিজিট করুন-
http://www.nirapad.org

অথবা নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন-
নিরাপদ
১৯/১৩ (নিচতলা), বাবর রোড, ব্লক- বি
মোহাম্মদপুর, ঢাকা- ১২০৭, বাংলাদেশ।

হ্যান্ডবুক

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব

হ্যান্ডবুক। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব

প্রকাশ: মার্চ, ২০১১

স্বত্ব: অক্সফাম-জিবি

আইএসবিএন: ৯৭৮-৯৮৪-৩৩-৩০৮৬-৪

সার্বিক তত্ত্বাবধান
কাজী সাহিদুর রহমান
জাহিদ হোসেন
মোঃ কাইছার রেজভী
জেসমিন বি. হোসেন

গবেষণা ও সম্পাদনা
কাজী মারুফুল ইসলাম
তাহমিনা রহমান
নারায়ন কুমার ভৌমিক
হাসিনা আক্তার মিতা
এ.এস.এম মাসুদুল হাসান
সৈয়দা তানিয়া ইসলাম

উপদেষ্টা
হামিদা বানু বেগম, *এনসিটিবি*
মোঃ আবু সাদেক পিইঞ্জ, *ডিএমবি*
সালমা আখতার, *আইইআর, ঢাবি*
নাশিদা আহমেদ, *আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়*
জিএফ হামিম, *ঢাকা আহছানিয়া মিশন*
মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, *ঢাকা আহছানিয়া মিশন*
তনিমা ফেরদৌস, *এফআইভিডিবি*

আলোকচিত্র: জাহিদ হোসেন

চিত্রণ: সুমন বৈদ্য

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ: অর্ক

বাণী

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য, অবস্থান ও প্রতিকূল পরিবেশের কারণে বাংলাদেশ অত্যন্ত দুর্যোগ প্রবণ দেশ হিসেবে পরিচিত। প্রতিনিয়ত সংঘটিত বিভিন্ন দুর্যোগ মানুষকে, বিশেষ করে নারীদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। সমাজে নারীদের অবস্থা ও অবস্থানগত পার্থক্য এবং বৈষম্যের কারণে পুরুষের তুলনায় নারীদের বিপদাপন্নতা বেশি। লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, নারীর এমন কিছু সক্ষমতা রয়েছে যা গোটা পরিবারের দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক হয়ে থাকে। বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারীরা দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য বিভিন্ন পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজ করে থাকে। দুর্যোগের সময় দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি আহত ও পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সেবা করা, পরিবারের সদস্যদের সহমর্মিতা জানানো, ত্রাণ সংগ্রহ করা, খাদ্য ও জ্বালানী সংগ্রহ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্বপালনকারী হিসেবে নারীরা কাজ করে। সাধারণতঃ নারীরা তাদের এ অবদানের স্বীকৃতি খুব কমই পেয়ে থাকে। তবে বিগত কয়েক বছরে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর অবদান কিছুটা স্বীকার করা শুরু হয়েছে।

অক্সফাম, একটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংগঠন, যারা বিশেষ গুরুত্বের সাথে জেন্ডার সমতা এবং দুর্যোগ পূর্বপ্রস্তুতি বিষয়ক কাজ করে থাকে। তারা দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশি অংশ নারীর ভূমিকাকে আরও কার্যকর করার পদক্ষেপ নিয়েছে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীদের এই কার্যকর অংশগ্রহণ পারিবারিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমরা আশা করি। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্বকে আরো বিস্তৃত করার জন্য অক্সফাম 'দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব' শীর্ষক এই হ্যান্ডবুকটি তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে। বিভিন্ন এনজিও কর্তৃক পরিচালিত প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে হ্যান্ডবুকটি প্রচার করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। কারণ শিক্ষক-শিক্ষিকারা স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে ভূমিকা রাখে, পাশাপাশি তাদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে, এমনকি এলাকাবাসীর মধ্যে ছড়িয়ে দেয়।

গ্যারেথ প্রাইস- জোনস্
কান্ট্রি ডিরেক্টর, অক্সফাম-জিবি, বাংলাদেশ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমরা প্রথমেই কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি অক্সফাম-জিবি'র প্রতি, এ ধরণের একটি নতুন এবং অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিরাপদ'কে সম্পৃক্ত করার জন্য এবং জনাব মোঃ কাইছার রেজভী ও জেসমিন বি. হোসেনকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি হ্যান্ডবুকটি তৈরির সময় তাদের সার্বিক সহযোগিতার জন্য। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নে সার্বিক সহযোগিতার জন্য জনাব জাহিদ হোসেন এর কাছে নিরাপদ আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। তাঁর সার্বিক নির্দেশনা ও নিরলস সহায়তা ছাড়া এই হ্যান্ডবুক প্রণয়ন করা সম্ভব হত না। এছাড়া হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নে সর্বাত্মক সহায়তার জন্য কনসালটেন্ট জনাব কাজী মারুফুল ইসলাম, তাহমিনা রহমান এবং জনাব নারায়ন কুমার ভৌমিক কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাই। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নের সময় উপদেষ্টা কমিটি হিসেবে গঠিত 'রিভিউ প্যানেল' এর সদস্যদেরকে (হামিদা বানু বেগম, উর্ধ্বতন কর্মকর্তা, এনসিটিবি; মোঃ আবু সাদেক পিইঞ্জ, পরিচালক, ডিএমবি; সালমা আখতার, পরিচালক, আইইআর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; নাশিদা আহমেদ, সিনিয়র কারিকুলাম স্পেশালিস্ট, আইইডি, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়; তনিমা ফেরদৌস, কারিকুলাম ডেভেলপার, এফআইভিডিবি; মোঃ জাহাঙ্গীর আলম, কো-অর্ডিনেটর, ডিএমইউডি এবং জিএফ হামিম, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, ইউনিক, ঢাকা আহছানিয়া মিশন)। নিরাপদ আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে হ্যান্ডবুকটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য। হ্যান্ডবুকটি সংকলনের সময় বিভিন্ন তথ্য এবং মূল্যবান মতামত প্রদানের মাধ্যমে হ্যান্ডবুকটিকে সমৃদ্ধ করার জন্য জনাব খুরশিদ আলম এর কাছে নিরাপদ কৃতজ্ঞ। মাঠ পর্যায়ে, খুলনায় ফিল্ড ভিজিট এর সকল আয়োজন বিশেষ করে, ওয়ার্কশপ এবং আইলা আক্রান্ত এলাকা পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে আমাদের উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য জনাব আতিক উজ-জামান কে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি এবং সিলেটে ফিল্ড ওয়ার্ক এ সহায়তার জন্য এফআইভিডিবি'কে বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি। হ্যান্ডবুকটি প্রণয়নের সময় দেশি ও বিদেশি বিভিন্ন সংস্থার মডিউল এবং প্রকাশনার সহযোগিতা নেয়া হয়েছে, এই সংস্থাগুলোর প্রতি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সর্বোপরি আমরা কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি যারা হ্যান্ডবুকটি মাঠ পর্যায়ে ব্যবহার করবেন। তাদের আন্তরিক প্রচেষ্টার মাধ্যমে হ্যান্ডবুকটির বিষয়বস্তু উত্তরোত্তর সকলের মাঝে সম্প্রসারিত হবে এই কামনা করছি।

কাজী সাহিদুর রহমান
কো-অর্ডিনেটর, নিরাপদ

হ্যান্ডবুকটির রূপরেখা

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব শীর্ষক এই হ্যান্ডবুকে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীর ভূমিকা বাংলাদেশের বাস্তবতার নিরিখে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। সাধারণত নারীকে সব থেকে বেশি বিপদাপন্ন গোষ্ঠী হিসাবে চিহ্নিত করা হয় ও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, এসব উদ্যোগ নারীর কাজের বোঝা বাড়ায়। যেমন- সংসারের সব দায়িত্ব পালনের অতিরিক্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি বা স্বেচ্ছাসেবী দলের কর্মী হিসাবে কাজ করতে হয়। বাস্তবক্ষেত্রে, সামাজিকভাবে অধস্তন অবস্থান ও বৈষম্যের মধ্যে থেকেও দৈনন্দিন কাজের মাধ্যমে নারী দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে অনেক অবদান রাখে। বিশেষ করে, দুর্যোগকালে যখন সকল সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রায় অচল হয়ে যায় ও আক্রান্ত জনগোষ্ঠী অন্যের সাহায্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে তখন সহজাতভাবেই নারী পরিবার ও জনগোষ্ঠীর দুর্দশা মোচনের ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। নারীর এই নেতৃত্বসূচক অবদান সচরাচর গোচরে আনা হয়না। এই হ্যান্ডবুকে নারীর ঝুঁকিগুলোর পাশাপাশি তার নেতৃত্বমূলক অর্জনগুলো সহজ ভাষায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এতে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, নারীর নিজস্ব কৌশল মূলধারার ঝুঁকিহ্রাস কৌশলের সাথে সম্পৃক্ত করতে পারলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ব্যবস্থাপনা আরো সমৃদ্ধ ও ফলপ্রসূ হবে।

হ্যান্ডবুকটি বাংলাদেশের সার্বিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেলের আঙ্গিকে রচনা করা হয়েছে ও ৬টি অধ্যায়ে বিভক্ত করা হয়েছে। নিম্নে প্রত্যেক অধ্যায়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হল:

প্রথম অধ্যায়: প্রথম অধ্যায়ে হ্যান্ডবুকটি তৈরি করার পটভূমি ও বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মডেল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়: দ্বিতীয় অধ্যায়ে ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে দুর্যোগের ধারণা, আপদ বিশ্লেষণ, বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ও ঝুঁকি বিবেচনা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। প্রতিটি আপদভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি ও নারীর উপর এর প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দুর্যোগে নারী কিভাবে ভুক্তভোগী হয় এবং সাধারণ ঝুঁকির অতিরিক্ত নারীর কী ঝুঁকি আছে তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান কিভাবে ঝুঁকি বিবেচনা করে ও এখানে নারীর অবস্থান কী তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়: তৃতীয় অধ্যায়ে ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পরিবার, সমাজ ও প্রতিষ্ঠান এর প্রতিরোধ ও প্রশমন, অভিযোজন এবং প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রমের ফলে নারীর সুবিধা অসুবিধা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায়: চতুর্থ অধ্যায়ে জরুরি সাড়া প্রদান সম্পর্কে আলোচনা করা হযেছে। এখানে সতর্ক সংকেত, স্থানান্তর, অনুসন্ধান, উদ্ধার, চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, খাপ খাওয়ানো ও টিকে থাকা, জরুরি ত্রাণ ও চিকিৎসা এবং জরুরি পুনর্বাসন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ কাজগুলো কারা করে, কিভাবে করে এবং এতে নারীর কী সুবিধা এবং অসুবিধা হয় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়: এ অধ্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী পুরুষের শ্রমবিভাজন, এক্ষেত্রে নারীর ঝুঁকি, নারীর প্রতি বৈষম্য আলোচনা করা হয়েছে এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়: এ অধ্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব কার্যকর করার প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পর্যায়ে কিভাবে নারীর নেতৃত্বকে আরো কার্যকর করা যায় সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

এই হ্যান্ডবুকের বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। দুর্যোগ ও নারীর নেতৃত্ব সম্পৃক্ত করে এ ধরণের কাজ এর আগে তেমন হয়নি। এ সম্পর্কিত তথ্য ও উপাত্তের ঘাটতি আছে। সিডর, আইলা এবং ২০০৭ সালের বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নারী ও পুরুষের পৃথক তথ্য খোঁজ করা হলেও পাওয়া যায়নি। সময় ও সম্পদের স্বল্পতার জন্য আরো গবেষণা করে বিষয়গুলো গভীরভাবে দেখার সুযোগ হয়নি। ফলে, কিছু কিছু সম্পর্কিত বিষয় আলোচনায় আসেনি। এই হ্যান্ডবুকের আলোচনা মূলত প্রান্তিক ও দুর্যোগ প্রবণ এলাকার দরিদ্র ও ভুক্তভোগী নারী কেন্দ্রিক। প্রতিবন্ধী বা গর্ভবতী বা অনুরূপ বিশেষ গোষ্ঠীভুক্ত নারীর সুনির্দিষ্ট ঝুঁকি সম্পর্কে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়নি। শহরবাসী বা বিত্তশালী পরিবারের নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি বিষয়ে আলোচনা এতে অন্তর্ভূক্ত হয়নি, যদিও তারা সব সময়ই দুর্যোগ ও নানাবিধ ঝুঁকির মধ্যে জীবনযাপন করে। তাছাড়া, ঝুঁকিহ্রাসে নারীর দৃষ্টিভঙ্গী ও মুখ্য ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা বাংলাদেশে বেশি ঘটে এমন কয়েকটা প্রাকৃতিক আপদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে। মানবসৃষ্ট আপদের বিষয়ে তেমন কিছু উল্লেখ করা হয়নি।

সুচিপত্র

বাণী ০৩
কৃতজ্ঞতা ০৪
হ্যান্ডবুকটির রূপরেখা ০৫

প্রথম অধ্যায়: পটভূমি ০৯

দ্বিতীয় অধ্যায়: ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ ১১
২.১. ঝুঁকি পরিবেশ ও নারী ১১
২.২. দুর্যোগের ধারণা ১২
২.২.১. দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি ১২
২.২.২. সেবাসমূহে বিঘ্ন ১৩
২.২.৩. দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংকট ১৩
২.২.৪. দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠীর চাহিদা ১৪
২.৩. আপদ বিশ্লেষণ ১৪
২.৩.১. বন্যা ১৪
২.৩.২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস ১৫
২.৩.৩. নদীভাঙ্গন ১৫
২.৩.৪. খরা ১৫
২.৩.৫. শৈত্য প্রবাহ ১৫
২.৩.৬. আর্সেনিক দূষণ ১৬
২.৩.৭. ভূমিকম্প ১৬
২.৩.৮. অগ্নিকান্ড ১৬
২.৩.৯. ইমারত ধ্বংস ১৬
২.৩.১০. ভূমিধ্বস ১৬
২.৩.১১. জলবায়ু পরিবর্তন ১৬
২.৪. বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ ১৭
২.৪.১. নারীর বিপদাপন্নতা ১৭
২.৫. ঝুঁকি বিবেচনা ১৮
২.৫.১. জাতীয় পর্যায়ে ঝুঁকি বিবেচনা ১৮
২.৫.২. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বিবেচনা ১৮
২.৫.৩ পরিবার পর্যায়ে ঝুঁকি বিবেচনা ১৯
২.৫.৪ নারীর ঝুঁকি বিবেচনা ১৯

তৃতীয় অধ্যায়: ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা ২১
৩.১. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নারী ২১
৩.২. প্রতিরোধ ও প্রশমন ২১
৩.২.১. প্রাতিষ্ঠানিক প্রশমনমূলক কাজ ২১
৩.২.২. পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে প্রশমন ২৩
৩.৩. অভিযোজন ২৩
৩.৪. প্রস্তুতি ২৪
৩.৪.১. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি ২৪
৩.৪.২. সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি ২৪
৩.৪.৩. পারিবারিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি ২৫

চতুর্থ অধ্যায়: জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদান ২৭
৪.১. জরুরি সাড়া ও নারী ২৭
৪.২. সতর্ক সংকেত ও পূর্ব সতর্কতা ২৭

৪.২.১. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সতর্ক বার্তা প্রচার ২৮
৪.২.২. সামাজিক পর্যায়ে সতর্ক বার্তা প্রচার ২৮
৪.২.৩. পরিবার পর্যায়ে সতর্ক বার্তা প্রচার ২৮
৪.৩. স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার ২৯
৪.৩.১. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার ২৯
৪.৩.২. সামাজিক পর্যায়ে স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার ২৯
৪.৩.৩. পারিবারিক পর্যায়ে স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার ৩০
৪.৩.৪. আশ্রয়কেন্দ্রে নারীর ঝুঁকি ৩০
৪.৪. চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ ৩১
৪.৪.১. প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ ৩১
৪.৪.২. নারীর ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ ৩১
৪.৫. খাপ খাওয়ানো ও টিকে থাকা ৩২
৪.৫.১. দুর্যোগে টিকে থাকায় নারীর ভূমিকা ৩২
৪.৫.২. পরিবারের জীবনধারণ প্রচেষ্টা ৩২
৪.৬. জরুরি ত্রাণ ও চিকিৎসা ৩৩
৪.৬.১. লক্ষ্যভূক্তিকরণ ও নারী ৩৩
৪.৬.২. ত্রাণ সামগ্রী ও নারীর চাহিদা ৩৩
৪.৬.৩. ত্রাণ বিতরণে নারীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা ৩৩
৪.৬.৪. জরুরি চিকিৎসা ৩৪
৪.৭. জরুরি পুনর্বাসন ৩৪
৪.৭.১. প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসন ও নারীর চাহিদা ৩৪
৪.৭.২. পরিবার পর্যায়ে পুনর্বাসন ও নারীর ভূমিকা ৩৫

পঞ্চম অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা ৩৭
৫.১. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী ৩৭
৫.২. নারী পুরুষের শ্রম বিভাজন ৩৭
৫.৩. নারীর ঝুঁকি ৩৮
৫.৪. নারীর নেতৃত্ব ৩৮
৫.৫. নারীর প্রতি বৈষম্য ৩৮
৫.৬. নারীর কাজের মূল্যায়ন ৩৯

ষষ্ঠ অধ্যায়: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণ ৪১
৬.১. নেতৃত্ব কার্যকর করার প্রক্রিয়া ৪১
৬.২. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রবর্তন ৪১
৬.২.১. প্রবেশাধিকার ৪১
৬.২.২. নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ৪২
৬.২.৩. তথ্য ও উপাত্ত ৪২
৬.২.৪. লক্ষ্য নির্ধারণ ৪৩
৬.৩. সামাজিক পর্যায়ে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রবর্তন ৪৩
৬.৩.১. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ৪৪
৬.৩.২. জনশিক্ষা ও প্রচার ৪৪
৬.২.৩. প্রদর্শনমুখি প্রকল্প ৪৫

পরিভাষা ৪৬
তথ্যসূত্র ৪৮

প্রথম অধ্যায়ঃ পটভূমি

বাংলাদেশ প্রায় প্রতি বছরই বিভিন্ন ধরণের প্রাকৃতিক আপদে আক্রান্ত হয়। এসব আপদের ফলে জীবন ও সম্পদের প্রভূত ক্ষয়ক্ষতি হয়; এতে পুরুষের তুলনায় নারীই বেশি ক্ষতির সম্মুখিন হয়। দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি বিষয়ক পরিসংখ্যান থেকে নারীর ক্ষতি ও দুর্দশার তীব্রতা বা পরিমাণ জানা যায়না। তবে, বিভিন্ন গবেষণা থেকে জানা যায় যে, দুর্যোগজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে নারীর মৃত্যুর হার পুরুষের মৃত্যুর হারের চেয়ে অনেক বেশি। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের উপর একটি গবেষণায় দেখা যায় যে, ২০-৪৪ বছরের নারীর মৃত্যুর সংখ্যা হাজারে ৭১ জন, পক্ষান্তরে একই বয়সী পুরুষের মৃত্যুর সংখ্যা হাজারে ১৫ জন [১]। ১৯৭০ সালে ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত এলাকার ২৫-৩০% নারী মারা যায়[২]। সমাজে নারী ও পুরুষের অবস্থা ও অবস্থানগত পার্থক্য এবং নারীর প্রতি বৈষম্যের কারণে নারীর বিপদাপন্নতা বেশি। ফলে নারী সহজেই দুর্যোগে পুরুষের তুলনায় সর্বাগ্রে এবং সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সামাজিক অধস্তন অবস্থান ও বৈষম্য সত্ত্বেও নারীর এমন কিছু সক্ষমতা রয়েছে যা শুধু নারীর নিজের জন্য নয় বরং গোটা পরিবারের জন্য দুর্যোগ মোকাবেলায় সহায়ক হয়ে থাকে।

বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে নারীরা দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য দুর্যোগের পূর্বে বিভিন্ন পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজ করে থাকে যেমন- আলগা চুলা তৈরি করা; বাড়িতে শুকনো খাবার- চিড়া, মুড়ি, গুড় ইত্যাদি মজুদ রাখা; ম্যাচ, মোমবাতি, হারিকেন, কেরোসিন, জ্বালানী তেল ইত্যাদি মজুদ রাখা; গবাদিপশু এবং হাঁসমুরগীর খাবার মজুদ রাখা; জ্বালানী যোগাড় করে রাখা ইত্যাদি। দুর্যোগের সময় দৈনন্দিন গৃহস্থালি কাজের পাশাপাশি আহত ও পরিবারের বয়স্ক সদস্যদের সেবা করা, পরিবারের সদস্যদের সহমর্মিতা জানানো, ত্রাণ সংগ্রহ করা, খাদ্য ও জ্বালানী সংগ্রহ করা প্রভৃতি ক্ষেত্রে প্রধান দায়িত্বপালনকারী হিসেবে নারীরা কাজ করে। যদিও পরিবারের দুর্যোগ মোকাবেলায় নারী যথেষ্ট অবদান রাখে, তবুও নারীর এ অবদান সামাজিকভাবে স্বীকৃতি পায়না।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করা হয়ে থাকে। বর্তমানে অনেক নারী সরকার ও এনজিওদের দ্বারা গঠিত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি'র সদস্য হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। তবে এখানেও নারীদেরকে অন্যতম বেশি বিপদাপন্ন ও ভুক্তভোগী গোষ্ঠীর সদস্য হিসাবে বিবেচনা করা হয়। অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলে নারীর বিপদান্নতা সাফল্যের সাথে কমানো যাবে ও ভুক্তভোগী নারীর জন্য সঠিকভাবে সেবা প্রদান করা যাবে, এই ধারণার ভিত্তিতে এসব উদ্যোগ পরিচালনা করা হয়ে থাকে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্বসূচক কাজ বা অন্যদের ঝুঁকিহ্রাসে নারীর অবদানের বিষয়গুলো এখন পর্যন্ত বিধিবদ্ধ হয়নি।

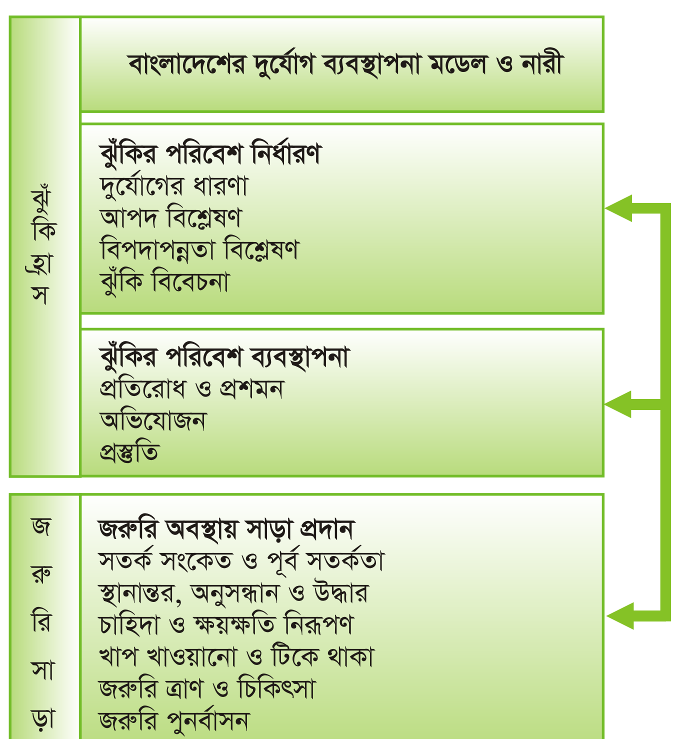

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ একটি ব্যবহারোপযোগী মডেল তৈরি করেছে। দু'টি প্রধান উপাদানের উপর ভিত্তি করে এই মডেলটি নির্মাণ করা হয়েছে। প্রথমত ঝুঁকিহ্রাস, যার মধ্যে রয়েছে ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ করা ও এর ভিত্তিতে ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা। প্রতিরোধ ও প্রশমন, অভিযোজন ও প্রস্তুতিমূলক সকল কাজ ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনার আলোকে বিবেচিত হয়। মডেলের দ্বিতীয় উপাদান হচ্ছে, জরুরি সাড়া প্রদান। এর মধ্যে রয়েছে সতর্ক সংকেত ও পূর্ব সতর্কতা, স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার, চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ, খাপ খাওয়ানো। এই মডেলের মূল বিষয় হল দুর্যোগের প্রেক্ষিতে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ঝুঁকি ও ঐ ঝুঁকিগুলো কমানো। কৌশলগতভাবে এতে অবকাঠামো নির্মাণ, সকল উন্নয়ন কার্যক্রমে ঝুঁকিহ্রাস কৌশল সম্পৃক্ত করা

[১]ইউনেপ, ২০০৫
[২]মির্জা, ১৯৯২

ও এর পাশাপাশি সামাজিক পর্যায়ে ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি নির্মাণ অন্তর্ভূক্ত। তবে এই মডেলেও নারী অন্যতম বেশি বিপদাপন্ন গোষ্ঠী হিসাবে বিবেচিত। নারীর স্বকীয় ক্ষমতা বা দুর্যোগ মোকাবেলায় নারীর নেতৃত্বসূচক ভূমিকা এই মডেলে খুব একটা সম্পৃক্ত হয়নি।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা বিশ্লেষণ ও নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণ

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা
নারী পুরুষের শ্রমবিভাজন
নারীর ঝুঁকি
নারীর নেতৃত্ব
নারীর প্রতি বৈষম্য
নারীর কাজের মূল্যায়ন

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণ
প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রবর্তন
সামাজিক পর্যায়ে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রবর্তন

বাংলাদেশ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগে নারীর বিপদাপন্নতা নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। এসব বিষয়ে প্রচুর গবেষণাপত্র, মডিউল, ম্যানুয়াল ও হ্যান্ডবুক আছে। তবে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব বিষয়ক উল্লেখযোগ্য কাজ খুব একটা করা হয়নি। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্বসূচক ভূমিকা সম্পৃক্ত করতে পারলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কৌশল আরো কার্যকর হবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে অক্সফাম-জিবি 'দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব' শীর্ষক হ্যান্ডবুক প্রণয়নের উদ্যোগ নিয়েছে। প্রাথমিক ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষিকার সাহায্যে এই হ্যান্ডবুক ব্যাবহার করা হবে। আশা করা হচ্ছে, এর মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি পরিহার সংস্কৃতি নির্মাণ কৌশল নতুন মাত্রা পাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ ঝুঁকি পরিবেশ নির্ধারণ

২.১. ঝুঁকি পরিবেশ ও নারী

ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ও অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। তিনটি বড় নদী - গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার নিম্ন অঞ্চলে এই ভূখন্ড অবস্থিত; এর উত্তরে রয়েছে হিমালয় পর্বতমালা ও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। বছরের গড় সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩৫ ও ১১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। হিমালয়ের বরফ গলা পানি ও বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বৃষ্টির পানি তিনটি বড় নদী দিয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবাহিত হয়। ফলে বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, শৈত্য প্রবাহ বা নদী ভাঙ্গনের মতো ঘটনা প্রতি বছরই এদেশের কোন না কোন অঞ্চলে ঘটে থাকে। বর্তমানে, ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিক দূষণ, দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে লবণাক্ততা বৃদ্ধি ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়ি এলাকায় ভূমি ধ্বসের ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশ ভূমিকম্প এলাকায় অবস্থিত; যেকোন সময়ে এখানে মারাত্মক ভূমিকম্প ঘটতে পারে। এছাড়াও, বিশেষ করে, শহর এলাকায় অগ্নিকান্ড ও ইমারত ধ্বস ঘটছে।

- ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক আপদ নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা
- দুর্যোগ জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষতি করে
- দুর্যোগের সময়ে নারীর দায়িত্ব ও কাজের বোঝা বাড়ে
- দুর্যোগকালে নারীর ঝুঁকি বেড়ে যায়
- ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমে নারীর বিশেষ চাহিদা বিবেচনা করা হয় না

এসব আপদের কারণে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়। মানুষ মারা যায়, অনেকে আহত হয়। ভৌত কাঠামো- কলকারখানা, বাড়িঘর, দালানকোঠা, রাস্তাঘাট, ব্রিজ, কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাঠের ফসল নষ্ট হয়। গৃহস্থালি সম্পদ নষ্ট হয়। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস বা নদী ভাঙ্গনের কারণে অনেক সময় প্রাকৃতিক পরিবেশ বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। অনেক নিচু এলাকা জলাবদ্ধ হয়ে পড়ে। বালু পড়ে ফসলের জমি চাষাবাদের অনুপযোগী হয়ে যায়। অনেক এলাকায়, বিশেষ করে উপকূল অঞ্চলে, জমি ও ভূগর্ভস্থ পানি অতিমাত্রায় লবণাক্ত হয়ে পড়ে। তাছাড়া, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে চলে যায়। এরফলে, মানুষের জীবনযাত্রা ও সামাজিক কাজকর্ম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। স্কুলকলেজ, চিকিৎসাকেন্দ্র ও অন্যান্য সেবা প্রতিষ্ঠানসমূহের কাজকর্মে ব্যাঘাত ঘটে। কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। হাটবাজার ও ব্যবসাবাণিজ্য অচল হয়ে পড়ে। মানুষের আয়রোজগারের সুযোগ লোপ পায়।

বাংলাদেশের সমাজ কাঠামোয় নারীর মর্যাদা ও অবস্থান অনেক নিচে। গৃহস্থালি কাজ, শিশু পরিচর্যা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যের সেবা করাই নারীর প্রধান ভূমিকা হিসাবে দেখা হয়। পরিবার প্রতিপালনে নারী যে অবদান রাখে তা অর্থনৈতিক মানদন্ডে মূল্যায়ন করার ব্যবস্থা নাই। পারিবারিক অর্থনীতিতেও নারী যথেষ্ট অবদান রাখে। এই অবদানের সামাজিক স্বীকৃতি খুব কম; জাতীয় আয়ে এর উল্লেখ থাকেনা। সম্পদের মালিকানায় নারীর অধিকার খুবই সীমিত। সেবাসমূহে বা হাটবাজারে নারীর প্রবেশগম্যতা প্রথাগত বিধিনিষেধ দ্বারা সীমিত। তবে, শ্রম বাজারে নারী অংশ নেয়, কিন্তু অবস্থান প্রান্তিক। কর্মজীবী নারীর অধিকাংশই দরিদ্র দিনমজুর; তারা ফসল তোলা ও পরবর্তী কাজে নিয়োজিত হয়। গ্রাম এলাকায় তারা মাটি কাটার কাজও করে। তবে পুরুষের তুলনায় নারী সাধারণত কম মজুরি পায়। শহরে অনেক দরিদ্র নারী খুব কম মজুরিতে অন্যের বাসায় কাজ করে; গ্রামে এ ধরণের কাজে নারী সাধারণত নগদ টাকায় মজুরি পায়না। অনেক কম বয়সী নারী পোশাকশিল্পে কাজ করে; তাদের বেতনও খুব কম। দুর্যোগকালে নারীর দায়িত্ব ও কাজের বোঝা অনেক বেড়ে যায়। দুর্যোগের কারণে আক্রান্ত পরিবারের আয় কমে যায়, ঘরে খাবার থাকেনা ও রান্না করার ব্যবস্থা থাকেনা। তারা নিজের বাড়িঘরে বাস করতে পারেনা। পানি আনতে হয় অনেক দূর থেকে। এমন অবস্থাতেও পরিবারের সকলের দেখাশোনা করা, বিশেষ করে, প্রতিদিনের খাবার তৈরি করা আর পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নারীর উপর বর্তায়। বিশেষ করে, নারী প্রধান গরীব পরিবার দুর্যোগের সময় বেশি সংকটে পড়ে। পরিবার প্রধান হিসাবে নারীকে একইসাথে আয় রোজগার করতে হয় ও পরিবারের অন্য সব সদস্যের দেখাশোনা করতে হয়। তদুপরি, দুর্যোগের সময় যখন জীবিকার সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়ে তখন এই নারীকে আয় রোজগারের জন্য পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় নামতে হয়। ঘূর্ণিঝড়ে বাড়িঘর ভেঙ্গে গেলে বা বন্যায় ঘরে পানি উঠলে পরিবারের সবাই অন্যত্র আশ্রয় নেয়। এসময় নারীর ঝুঁকি অনেক বেড়ে যায়। অস্থায়ী আশ্রয়ে ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা থাকেনা। প্রস্রাব, পায়খানা বা গোসল করার নিরাপদ জায়গা থাকেনা। তাছাড়া, স্বাভাবিক সামাজিক সুরক্ষা এ সময়ে অনেকাংশে শিথিল হয়ে পড়ে। ফলে, নারী লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতন ও যৌন হয়রানির শিকার হয়।

দুর্যোগ কবলিত জনগোষ্ঠী ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও ব্যাধিতে ভোগে। তারা আশ্রয়হীন ও নিরাপত্তাহীন জীবন যাপন করে। ফলে, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। এ অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য অন্যের সহায়তা দরকার হয়। সহায়তা কার্যক্রমগুলো সাধারণত খাত ভিত্তিক হয়ে থাকে, যেমন- আবাসন, খাদ্য, স্বাস্থ্য, নিরাপদ পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, কৃষি বা অবকাঠামো নির্মাণ। প্রায়শঃই, এই সহায়তা কার্যক্রমে নারীর দুর্দশা লাঘবের জন্য প্রয়োজনীয় সব উপাদান থাকেনা।

২.২. দুর্যোগের ধারণা

বাংলাদেশের পটভূমিতে দুর্যোগের প্রসঙ্গ উঠলে প্রথমেই মনে আসে ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার কারণে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি, বিপর্যস্ত জীবনযাত্রা ও জনগোষ্ঠীর দুর্দশা। অন্যের সহায়তা ছাড়া স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসা আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জন্য কষ্টসাধ্য। দুর্যোগের এই ছবিতে দু'টি মাত্রা ফুটে ওঠে। প্রথমত, প্রাকৃতিক আপদের (যেমন- ঘূর্ণিঝড় বা বন্যা) তীব্রতা ও বিধ্বংসী প্রভাব; দ্বিতীয়ত, জনগোষ্ঠীর এসব প্রাকৃতিক আপদ সহন ক্ষমতার সীমা। আরো একটা বিষয় এতে প্রচ্ছন্ন, তা হল- এসব দুর্যোগ সাধারণত ঘটে প্রান্তিক এলাকা বা প্রত্যন্ত অঞ্চলে।

২.২.১. দুর্যোগে ক্ষয়ক্ষতি

প্রাকৃতিক আপদ জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। ১৯৭০ ও ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে উপকূল অঞ্চলে যথাক্রমে ৪৭০,০০০ ও ১৩৮,৮৮২ জন মারা গিয়েছিল। সাম্প্রতিক ঘূর্ণিঝড় সিডরে সরকারি হিসাব মতে নিহতের সংখ্যা ছিল ৩,৩৬৩ জন ও নিখোঁজ ১,০০১ জন। সাগরে মাছ ধরতে গিয়ে অনেক জেলে নিহত বা নিখোঁজ হয়েছিল, তবে ঘূর্ণিঝড়ে নিহত ও আহতের মধ্যে নারী ও শিশুর সংখ্যা ছিল সব থেকে বেশি। ২০০৭ সালে বন্যায় সারাদেশে ৩,৭০৫ কিলোমিটার রাস্তা, ৮৮ কিলোমিটার বাঁধ, ৩৬০ টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৫৬৩ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। সিডরে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছিল ১,৭৪১ কিলোমিটার রাস্তা, ১,৮৭৫ কিলোমিটার বাঁধ, ১,৬৮৭ টি ব্রিজ/কালভার্ট ও ৪,২৩১ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। ২০০৭ সালে বন্যা ও সিডর আক্রান্ত পরিবারগুলোর যথাক্রমে ৮৯০,৮৯৮ ও

- দুর্যোগে যারা জীবন হারায় তাদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই বেশি
- দুর্যোগে নারী গৃহস্থালী সামগ্রী হারায়
- পরিবেশের ক্ষতির কারণে নারী খাদ্য, জ্বালানী ও পানি সংকটে পড়ে
- সেবাসমূহ বিঘ্ন ঘটলে নারী তুলনামূলকভাবে বেশি বঞ্চিত হয়
- পরিবারে, দুর্যোগজনিত সকল সংকট শেষ পর্যন্ত নারীর উপর এসে বর্তায়
- দুর্যোগ সহায়তার মূল লক্ষ্য নারীর চাহিদা মেটানো নয়, বরং অর্থনৈতিক ক্ষতিপূরণ করা

৭৪৩,৩২২ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছিল, আর যথাক্রমে ৬২,৯৫৬ ও ৫,৬৩,৮৭৭ টি বাড়িঘর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়েছিল। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের নারী গৃহস্থালি সামগ্রী হারিয়েছিল; আর তাদের কাছে কোন খাবার ছিলনা।

সিডরের কারণে সুন্দরবনের ১,৯০০ বর্গকিলোমিটার বনভূমিতে কেওড়া, গেওয়া, সুন্দরি ও গোলগাছ মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরসাথে সুন্দরবনের জীববৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। ফলে, সুন্দরবনের কাঠ, গোলপাতা, মধু, মাছ ও কাঁকড়া আহরণের উপর নির্ভরশীল পরিবারের নারী খাদ্য ও জ্বালানির অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। আইলার প্রভাবে দক্ষিণ খুলনার কয়েকটি উপজেলার বিস্তীর্ণ এলাকা প্রায় স্থায়ীভাবে লবণ পানিতে ডুবে গেছে ও সেখানকার ভূগর্ভস্থ পানি লবণাক্ত হয়ে পড়েছে। ঐ এলাকায় বসবাসকারী পরিবারের নারীকে পানি সংগ্রহের জন্য বহুদূর, এমনকি নদী পার হয়ে অন্য এলাকায় যেতে হচ্ছে।

২.২.২. সেবাসমূহে বিঘ্ন

দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতির কারণে সেবাসমূহে বিঘ্ন ঘটে ও বাজার ব্যবস্থা ব্যাহত হয়। এর ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী, বিশেষ করে নারী, বঞ্চনা ও দুর্দশার শিকার হয়। সিডর আক্রান্ত ৯ টি জেলার দুর্গত অঞ্চলে যোগাযোগ ব্যবস্থা এমনভাবে বিধ্বস্ত হয়েছিল যে সেখানে জরুরি ত্রাণ সরবরাহ কঠিন হয়ে পড়ে। কোথাও কোথাও হাটবাজার একেবারে বন্ধ হয়ে যায়, আর যেখানে বাজার ব্যবস্থা কিছুটা চালু ছিল সেখানেও জিনিসপত্রের দাম অনেক বেড়ে গিয়েছিল। প্রায় ৮,০০০ স্কুল বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয় চিকিৎসাকেন্দ্রগুলো আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে স্বাস্থ্যসেবা দিতে অসমর্থ হয়ে পড়ে। ১,৪৪৪,৬৭৪ জন নারী, শিশু ও পুরুষ সম্পূর্ণরূপে আশ্রয়হীন হয়ে পড়ে।

২.২.৩. দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠীর সংকট

দুর্যোগ আক্রান্ত পরিবারগুলো খাবার, পানি, স্যানিটেশন ও চিকিৎসার অভাবে খুবই কষ্ট ভোগ করে। এসব পরিবারে নারীর সমস্যা আরো বেশি। সিডরে ক্ষেতের ফসল হারিয়ে ও আয়ের উৎস হারিয়ে পরিবারগুলো যে সংকটে পড়েছিল তার বোঝা নারীর উপরই পড়েছিল। ঐসব পরিবারের খাদ্য মজুত ছিলনা, থাকার জায়গা ছিলনা, রান্নার সরঞ্জাম ছিলনা, তা সত্ত্বেও নারীকেই পরিবারের সবার জন্য দুবেলা খাবারের

ব্যবস্থা করতে হয়েছে। আবার ঘরদোর পরিষ্কার করা, ঘর মেরামত ও রাস্তা মেরামতের কাজও করতে হয়েছে। সিডর বা আইলায় যেসব পরিবারের প্রধান আয়কর্তা নিহত, নিখোঁজ অথবা গুরুতরভাবে জখম হয়েছিল সেসব পরিবারের নারীকে পরিবার প্রধানের দায়িত্ব নিতে হয়েছিল। এই কাজে তাদের কোন অভিজ্ঞতা ছিলনা, তাই এটা তাদের জন্য ছিল খুব কষ্টসাধ্য। পরিবার প্রধান হিসাবে ঐসব নারীকে ঘরসংসারের কাজ- পানি আনা, রান্না করা, শিশুর যত্ন নেওয়া, ও একই সাথে আয় রোজগারের জন্য কাজ করতে হয়েছে। সিডর, আইলা বা ২০০৭ সালের বন্যায় যেসব নারী নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছিল তাদের পক্ষে নিজের ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করা কঠিন ছিল। এছাড়াও, সুরক্ষিত আশ্রয় না থাকায় ঐ সময় তাদের নির্যাতন ও যৌন হয়রানির ঝুঁকি অনেক গুণ বেড়ে গিয়েছিল। এই অস্বাভাবিক ও অনিশ্চিত জীবনযাত্রার কারণে অথবা দুর্যোগে প্রিয়জন হারানোর জন্য অনেক নারী মানসিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

২.২.৪. দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠীর চাহিদা

আক্রান্ত জনগোষ্ঠী বাইরের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র নিজের চেষ্টাতে আগের মত স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে পারেনা। এক জরিপে, সিডর আক্রান্ত জেলাগুলোতে ৪০ থেকে ৫০ লক্ষ লোকের জন্য খাদ্য সহায়তা ও ২ লক্ষ পরিবারের জন্য বাসস্থান সহায়তা প্রয়োজন হবে বলে অনুমান করা হয়েছিল। এর প্রেক্ষিতে, খাদ্য ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় ১৫.৯ বিলিয়ন টাকার স্বল্পমেয়াদি ও আরো ৭২ বিলিয়ন টাকার দীর্ঘমেয়াদি সহায়তা কার্যক্রমের প্রস্তাব করেছিল। এই সহায়তা প্রস্তাবে খাদ্য বিতরণ, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, বাসস্থান নির্মাণ, ভৌত কাঠামো নির্মাণ, ও কৃষি খাতে সহায়তা অগ্রাধিকার পেয়েছে। তবে, এতে গর্ভবতী ও প্রসূতি সেবা ছাড়া নারীর বিশেষ চাহিদা বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তেমন কিছু ছিলনা।

২.৩. আপদ বিশ্লেষণ

প্রাকৃতিক আপদ বিবিধ ক্ষয়ক্ষতি ঘটায় ও দুর্যোগের সৃষ্টি করে। আপদের ধরণ ও তীব্রতার উপর নির্ভর করে ক্ষয়ক্ষতির ধরণ বা পরিমাণ। বাংলাদেশ সচরাচর যেসব আপদের সম্মুখীন হয় সেগুলো হল- বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, খরা, শৈত্য প্রবাহ ও আর্সেনিক দূষণ, ভূমিকম্প, অগ্নিকান্ড, ইমারত ধ্বস, ভূমিধ্বস।

২.৩.১. বন্যা

পানি প্রবাহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির ফলে প্লাবন মুক্ত এলাকা পানিতে ডুবে গেলে বন্যা সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে বন্যা একটা নৈমিত্তিক ঘটনা। প্রায় প্রতি বছরই দেশের কোথাও না কোথাও বন্যা ঘটে ও বন্যার ব্যাপকতাভেদে, দেশের ২০ থেকে ৬৮ শতাংশ ভূভাগ প্লাবিত হয়। এই বন্যায় সম্পদ, ফসল ও ভৌত কাঠামোর ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। বাংলাদেশে চার ধরণের বন্যা হয়- আকস্মিক বন্যা, অতিবৃষ্টি জনিত বন্যা, মৌসুমি বন্যা ও জোয়ার সৃষ্ট বন্যা।

আকস্মিক বন্যা- উজানে অতিবৃষ্টি হলে নদীর পানির উচ্চতা দ্রুত বেড়ে যায় ও নদীর পানি তীব্র স্রোতে দুকূল ছাপিয়ে ফসলের মাঠ ও জনপদ প্লাবিত করে। এরফলে, মাঠের ফসল নষ্ট হতে পারে; গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি ভেসে যেতে পারে; বাঁধ, রাস্তা ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; বাড়িঘর ও গৃস্থালি সামগ্রী নষ্ট হতে পারে। সাধারণত এপ্রিল-মে মাসে দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে এই বন্যা দেখা দেয়।

অতিবৃষ্টি জনিত বন্যা- পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা অপ্রতুল হলে, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে একটা এলাকা প্লাবিত হতে পারে। এরফলে, মাঠের ফসল নষ্ট হতে পারে; ভৌত কাঠামো- যেমন, বাঁধ, রাস্তা, কালভার্ট ও বাড়িঘর, গৃহস্থালি সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে ও নিচু এলাকা জলাবদ্ধ হতে পারে। ২০০০ সালে যশোর-খুলনা অঞ্চলে এ ধরণের বন্যা হয়েছিল।

মৌসুমি বন্যা- বর্ষা কালে নদীর পানির উচ্চতা বেড়ে যায় ও দুকূল ছাপিয়ে তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত করে। এরফলে, মাঠের ফসল নষ্ট হতে পারে; গবাদিপশু ও হাঁসমুরগি ভেসে যেতে পারে; বাঁধ, রাস্তা ও কালভার্ট ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে; বাড়িঘর ও গৃহস্থালি সামগ্রী নষ্ট হতে পারে। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী প্রণালীর অববাহিকায় জুন-সেপ্টেম্বর কালে এই বন্যা হয়।

জোয়ার সৃষ্ট বন্যা- জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানির উচ্চতা বেড়ে যায় ও ভূভাগের নিষ্কাশন প্রণালী আবদ্ধ করে ফেলে ভূভাগ প্লাবিত হয়। উপকূল অঞ্চলে এই বন্যা দেখা দেয়। এরফলে, মাঠের ফসল নষ্ট হতে পারে ও জলাশয়ের পানি লবণাক্ত হয়ে যেতে পারে।

বড় রকমের বন্যা হলে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে। সেবাসমূহ ও বাজার ব্যবস্থা অচল হয়ে যেতে পারে ও প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। এরকম বিপর্যয়ে আক্রান্ত পরিবারের নারী তার কর্তৃত্বাধীন গৃহস্থালি সামগ্রী, সবজি বাগান ও হাঁসমুরগি হারায় ও নিজের বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এরফলে, সে তার নৈমিত্তিক দায়িত্ব পালন করতে পারেনা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা করতে পারেনা ও নানাবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

১৯৯৮, ১৯৯৯, ২০০০, ২০০৪ ও ২০০৭ সালে ক্ষতিকর বন্যা হয়েছিল। ২০০৭ সালের বন্যায় দেশের শতকরা ৪০ ভাগেরও বেশি এলাকা প্লাবিত হয়েছিল; এতে ২,২৬৪,৯৩৩ পরিবার ভুক্তভোগী ও ৬২,৯৫৬ ও ৮৮১,৯২২ টি বাড়ি, যথাক্রমে, সম্পূর্ণ ও আংশিক রূপে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

২.৩.২. ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ে রূপ নিয়ে বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলে আঘাত হানে। সাধারণত এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় দেখা দেয়। ঘূর্ণিঝড়ের সাথে সবসময় জলোচ্ছ্বাস থাকে। এই আপদ খুবই বিধ্বংসী। এরফলে, ব্যাপক প্রাণহানি ও সম্পদহানি ঘটে ও পরিবেশ ধ্বংস হয়। ঘূর্ণিঝড় কবলিত পরিবারের নারী নিজে মারা যেতে পারে বা আহত হতে পারে অথবা পরিবার পরিজন হারাতে পারে। এই দুর্যোগে নারী সম্পূর্ণরূপে আশ্রয়হীন ও সম্পদহীন হয়ে পড়তে পারে; খাবার, বাসস্থান, চিকিৎসা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও সামাজিক নিরাপত্তার অভাবে কষ্ট পেতে পারে। ১৯৯১, ১৯৯৭, ২০০৭ ও ২০০৯ সালে উপকূল অঞ্চলে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় আঘাত হেনেছিল। এতে ২,০৬৪,০২৬ পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ৫৬৩,৮৭৭ টি বাড়ি আংশিকরূপে ও ৯৫৫,০৬৩ টি বাড়ি সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়।

২.৩.৩. নদী ভাঙ্গন

নদী ভাঙ্গন একটা চলমান প্রক্রিয়া। পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদী খুবই ভাঙ্গন প্রবণ। এই আপদের কারণে নদী তীরবর্তী ফসলের জমি ও লোকালয় ক্রমে ক্রমে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। আপদ কবলিত পরিবার জমি হারায়, বাস্তুহারা হয় ও স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হয়। পরিবারের নারী সম্পদহারা হয় ও সামাজিক সম্পর্ক জাল ও পরিচিতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

১৯৭৪ থেকে ২০০৪ সাল সময়ে পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্র নদীর ভাঙ্গনে, যথাক্রমে, প্রায় ২৯,৩৯০ ও ৮৭,৭৯০ হেক্টর জমি নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। বছরে গড়ে ১০ লক্ষ লোক বাস্তুহারা হয়েছে।

২.৩.৪. খরা

দীর্ঘকালীন শুষ্ক আবহাওয়া ও অনাবৃষ্টির কারণে খরা দেখা দেয়। খরা পীড়িত অঞ্চল তপ্ত হয়ে ওঠে। জলাশয়ের পানি শুকিয়ে যায়, নদীপ্রবাহ হ্রাস পায়, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যায় ও মাটির আর্দ্রতায় ঘাটতি দেখা দেয়। ফলে, ক্ষেতের ফসল শুকিয়ে শস্য বিপর্যয় ঘটে। পশু পালন ও হাঁসমুরগি পালন করা কঠিন হয়। খরা একটি মারাত্মক আপদ। এর প্রভাবে কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠী খাদ্য সংকট ও অর্থাভাবের সম্মুখীন হয়। খরাপীড়িত এলাকায় নারীর পক্ষে পরিজনের পুষ্টিমান বজায় রাখা ও দৈনন্দিন পানির চাহিদা মেটানো দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। এছাড়া, পরিবারের পুরুষ সদস্য খরার সময়ে কাজের সন্ধানে অন্যত্র চলে যায়। ঐসব পরিবারের নারী যৌন নির্যাতনসহ বিবিধ ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।

সাধারণত দেশের উত্তরাঞ্চলে খরার প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। প্রতিবারে গড়ে দেশের ৪৭ শতাংশ এলাকা ও জনসংখ্যার ৫৩ শতাংশ খরাপীড়িত হয়। ১৯৪৯ থেকে ১৯৯১ সাল সময়ে এদেশে ২৪ বার খরা দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে ১৯৫১, ১৯৫৭, ১৯৫৮, ১৯৬১, ১৯৭২, ১৯৭৫, ১৯৭৯, ১৯৮১, ১৯৮৪ ও ১৯৮৯ সালের খরা খুবই মারাত্মক ছিল। এরপরে, ১৯৯৪-৯৫ সালের খরা ছিল খুব দীর্ঘস্থায়ী, এতে ব্যাপক শস্যহানী ঘটে।

২.৩.৫. শৈত্য প্রবাহ

শীতকালে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে নেমে শৈত্য প্রবাহের সৃষ্টি করে। এই প্রবাহ ৩ থেকে ৫ দিন কিংবা আরো বেশি দিন চলতে পারে। কখনো কখনো তাপমাত্রা ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে আসে। এসময় বাতাসের আর্দ্রতা বেড়ে যায় ও ঘন কুয়াশার কারণে সূর্যালোক ভূপৃষ্ঠে পৌঁছাতে পারেনা। এই আবহাওয়াতে জনজীবন স্থবির হয়ে পড়ে। দরিদ্র জনগোষ্ঠী কাজকর্ম করতে পারেনা ও তাদের কোন আয় থাকেনা। তারা খাদ্য সংকটে পড়ে। তাছাড়া, তাদের উপযুক্ত শীতের কাপড় থাকেনা, তারা শীতে কষ্ট পায়। অনেকে নিউমোনিয়া বা শ্বাসকষ্টে ভোগে। অতিরিক্ত ঠান্ডায় বা নিউমোনিয়ার কারণে শিশু ও বৃদ্ধ ব্যক্তি মারা যেতে পারে। দরিদ্র পরিবারের নারী শৈত্য প্রবাহে খুবই কষ্ট পায়। প্রচন্ড শীতের মধ্যেও তাকে খুব ভোরে উঠে পানি আনতে হয়, রান্না করতে হয়, ধোয়ামোছা করতে হয়। বিশেষ করে প্রসূতি মা ও নবজাত শিশু এ সময়ে খুব ঝুঁকির মধ্যে থাকে।

বাংলাদেশ প্রতি বছরই শৈত্য প্রবাহে আক্রান্ত হয়। ২০০৬ সালে শৈত্য প্রবাহে ১০০,০০০ জন ভুক্তভোগী হয়েছিল, এর মধ্যে ১৩০ জন মৃত্যু বরণ করেছিল। আর ২০০৭, ২০০৮ ও ২০০৯ সালে দেশের বিভিন্ন এলাকায় শৈত্য প্রবাহে মৃত্যু বরণ করেছিল যথাক্রমে, ৩৬৯, ৫৫ ও ১৩৫ জন।

২.৩.৬. আর্সেনিক দূষণ

সাম্প্রতিক কালে আর্সেনিক দূষণ একটি ভয়াবহ আপদ হিসাবে দেখা দিয়েছে। অতিমাত্রায় ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলন করার কারণে ভূতলে বায়ু প্রবেশ করছে ও বায়ুর প্রভাবে ভূগর্ভস্থ সঞ্চিত আর্সেনোপাইরেট বিযুক্ত হয়ে পানিতে মিশে যাচ্ছে। এরফলে দেশের অনেক অঞ্চলে নলকূপের পানিতে আর্সেনিকের পরিমাণ সহনীয় মাত্রা থেকে অনেক বেশি মাত্রায় বিরাজ করছে। এই পানি পান করে জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ আর্সেনিকোসিস রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। এই রোগের লক্ষণ খুব ধীরে প্রকাশ পায়। রোগের প্রারম্ভে আক্রান্ত ব্যক্তির ত্বকের রং ক্রমশ কালচে হয়ে যায়। পরে হাত ও পায়ের তালু শক্ত হয়ে যায় ও শরীরে আঁচিলের মত শক্ত গোটা উঠে; ধীরে ধীরে তালুতে ঘা দেখা দেয়, রক্তনালীতে ক্ষত সৃষ্টি হয়, ত্বকের ক্যানসার দেখা দেয় ও শরীরে পচন ধরে। আর্সেনিকোসিসে আক্রান্ত নারী শারীরিকভাবে কষ্ট পায়। সেই সাথে সে পরিবার ও সমাজে মর্যাদা হারায়, প্রায় একঘরে হয়ে পড়ে ও বিবিধ বঞ্চনার শিকার হয়।

দেশের ৬৪টি জেলার মধ্য ৬১ জেলার ভূগর্ভস্থ পানিতে বিভিন্ন মাত্রায় আর্সেনিক দূষণ রয়েছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের জেলাগুলোর পানি বেশিমাত্রায় আর্সেনিক দূষণ যুক্ত। বাংলাদেশের প্রায় ১২৫.৫ মিলিয়ন লোক বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা নির্ধারিত সহন মাত্রা থেকে বেশি মাত্রার আর্সেনিক দুষণযুক্ত পানি পান করে।

২.৩.৭. ভূমিকম্প

ভূপ্রাকৃতিক বৈশিষ্টের কারণে দেশের উত্তরপূর্বাঞ্চল বেশিমাত্রায় ভূমিকম্প প্রবণ। গত দেড়শ বছরে এদেশে অন্তত সাতবার বড় ধরণের ভূমিকম্প ঘটেছে। সাম্প্রতিক উল্লেখযোগ্য ভূমিকম্পের ঘটনা ঘটেছে ১৯৯৭ সালে সিলেট ও বান্দরবনে, ১৯৯৯ সালে মহেশখালিতে ও ২০০৩ সালে বরকলে। নিকট ভবিষ্যতে মারাত্মক ভূমিকম্প আঘাত হানতে পারে বলে আশংকা করে হচ্ছে। ভূমিকম্পে ভৌতকাঠামো ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও অনেক জীবনহানী ঘটে। সাধারণত শহর ও বাণিজ্যকেন্দ্র বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়; ফলে জাতীয় অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ব্যহত হয়। ভূমিকম্পে নারী ও শিশুর জীবনহানী বেশি ঘটে। নারী ঘর ও ঘরের জিনিসপত্র হারায়।

২.৩.৮. অগ্নিকান্ড

পোষাক তৈরি কারখানা, বস্তি ও শহরের ঘন বসতি এলাকায় আগুন লাগার ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। কিছুদিন আগে একটা বহুতল বিপনিবিতানে আগুন লেগে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। ২০১০ সালে সারাদেশে আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে ১৪,৪৫৪ বার। এতে মারা গেছে ১৯৩ জন ও আহত হয়েছ ২০৫ জন; সম্পদের ক্ষতি হয়েছিল প্রায় ৫,২২৫ কোটি টাকার। অগ্নিকান্ডে বেশি মারা যায় নারী ও শিশু। তাছাড়া, নারী ঘর ও ঘরের জিনিসপত্র সব হারিয়ে একেবারে উদ্বাস্তু হয়ে পড়ে।

২.৩.৯. ইমারত ধ্বস

ঢাকা শহরে বহুতল ভবন- বসতবাড়ি ও পোশাক তৈরি কারখানা ধ্বসে পড়ার প্রবণতা বাড়ছে। এতে অনেক মানুষ হতাহত হয়। বিশেষ করে পোশাক তৈরি কারখানা ভবন ধ্বসে হতাহতের মধ্যে নারীর সংখ্যা থাকে অনেক বেশি।

২.৩.১০. ভূমিধ্বস

প্রায় প্রতিবছরই চট্টগ্রাম এলাকায় ভূমিধ্বসের ঘটনা ঘটে। এতে ঘর ও ঘরের জিনিসপত্র ধ্বংস হয় ও মাটি চাপা পড়ে মানুষ মারা যায়। নিহতদের মধ্যে অধিকাংশই থাকে নারী ও শিশু।

২.৩.১১. জলবায়ু পরিবর্তন

বৈশ্বিক উষ্ণতা ও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির কারণে বাংলাদেশ খুবই ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ১৯৮৫-১৯৯৮, এই ১৪ বছরে মে মাসে ১.০ ডিগ্রি ও নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি বৃদ্ধি পেয়েছে। আশংকা করা হচ্ছে যে, গ্রীষ্মকালে বেশিমাত্রায় হিমালয়ের বরফ গলবে ও নদীর প্রবাহ বাড়বে। সেইসাথে বৃষ্টিপাত অনিশ্চিত হয়ে পড়বে। ফলে বন্যার প্রকোপ ও নদী ভাঙ্গনের মাত্রা বাড়বে। শুষ্ক মৌসুমে নদীগুলো একেবারে শুকিয়ে যাবে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাবে ও দেশের উত্তরাঞ্চল খরা পীড়িত হবে। বর্তমান কৃষিব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়তে পারে। দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘূর্ণিঝড়ের তীব্রতা বাড়বে ও বিস্তীর্ণ এলাকায় নদী, জলাশয় ও ভূগর্ভস্থ পানি অধিকমাত্রায় লবণাক্ত হয়ে পড়বে। কৃষি নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা অতিমাত্রায় সংকুচিত হয়ে পড়বে আর উপকূল অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর বিরাট অংশ জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে স্থানান্তরিত হতে বাধ্য হবে। পারিবারের জীবিকা সংকট ও স্থানান্তরের জন্য নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাগুলো আরো প্রকট হয়ে উঠবে। তাদের নিজস্ব আয় ও সম্পদ কমে যাবে। তারা চিকিৎসা ও শিক্ষা লাভের সুযোগ হারাবে। বিপুল সংখ্যক নারী প্রায় উদ্বাস্তু হয়ে অন্যের ভিটেমাটিতে বাস করতে বাধ্য হবে। সম্পদের স্বল্পতার কারণে তাদের আবাসগুলো হবে জীর্ণ- সেগুলো শীত, বর্ষা বা প্রতিকূল আবহাওয়াতে তেমন সুরক্ষা দিতে পারবেনা। ক্রমবর্ধমান ও পৌনঃপুনিক আপদে তাদের জীবনযাত্রা প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হতে থাকবে।

২.৪. বিপদাপন্নতা বিশ্লেষণ

দুর্যোগে আক্রান্ত সকল জনগোষ্ঠী বা একই জনগোষ্ঠীর সকল সদস্য সমানভাবে বিপদাপন্ন হয়না। যাদের বিপদাপন্নতা বেশি তারা আপদের আঘাতে কাতর হয়ে পড়ে ও জীবনযাত্রা স্বাভাবিকভাবে চালিয়ে যেতে পারেনা। আর যাদের বিপদাপন্নতা কম, তারা আপদের আঘাত অপেক্ষাকৃতভাবে কম অনুভব করে। তাদের ক্ষতি কম হয় ও ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও তারা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় অনেকটা ফিরে আসতে পারে। ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতার মাত্রা ভৌত পরিবেশ, ভৌগোলিক অবস্থান, ভৌত কাঠামো ও স্থাপনা, প্রাতিষ্ঠানিক সম্পর্ক, আর্থসামাজিক অবস্থা এবং জ্ঞান, সচেতনতা ও দক্ষতা দ্বারা প্রভাবিত হয়।

বিপদাপন্নতার প্রভাবক

পরিবেশ ও অবস্থানগত- যারা আপদপ্রবণ এলাকায় বাস করে তারা বেশিমাত্রায় আপদের মুখোমুখি হয় ও বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন, উপকূল অঞ্চলে বসবাসকারী পরিবার ঘূর্ণিঝড়ে আক্রান্ত হয়; চরে নিচু এলাকার বসতি বন্যায় প্লাবিত হয়; নদীর পাড়ে বসবাসকারী পরিবারগুলো নদী ভাঙ্গনে বাড়িঘর হারায়। বারবার দুর্যোগপীড়িত হওয়ার কারণে তারা ক্রমাগত অর্থ ও সম্পদ হারায় ও বেশিমাত্রায় বিপদাপন্ন হয়ে পড়ে। তাছাড়া, প্রান্তিক এলাকায়, যেমন- চর অঞ্চল বা ভাঙ্গনপ্রবণ নদী তীর সংলগ্ন এলাকায়, প্রাকৃতিক সুরক্ষা থাকেনা বা সেখানে মজবুত বা আপদ সহনশীল ভৌত কাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হয়না। এসব এলাকায় বসবাসকারীর বিপদাপন্নতার মাত্রা বেশি হয়ে থাকে।

ভৌত কাঠামো ও স্থাপনা- শক্ত দালানকোঠা বা মজবুত বাড়িঘর ঝড় ঝঞ্ঝায় টিকে থাকতে পারে; উঁচু ভিটার বাড়ি বন্যায় ডোবেনা। শক্ত বাঁধ বন্যা বা জলোচ্ছ্বাস থেকে রক্ষা করে। টেকসই রাস্তা থাকলে দ্রুত নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া যায়। এগুলো বিপদাপন্নতা কমায়। আর এসবের ঘাটতি হলে পরিবার ও জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতা বেড়ে যায়।

আর্থসামাজিক অবস্থা- জনগোষ্ঠীর দরিদ্র ও সুবিধা বঞ্চিত অংশ সাধারণত ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় বাস করতে বাধ্য হয় ও সম্পদের স্বল্পতার কারণে মজবুত বা আপদ সহিষ্ণু বাড়িঘর বানাতে পারেনা। ফলে তারা বেশি মাত্রায় বিপদাপন্ন হয়। তার উপর, তাদের জীবিকার উপায়সমূহ দুর্বল বা অনিশ্চিত হলে, যেমন- প্রান্তিক চাষাবাদ, মাছধরা, দিন মজুরি, নৌকা চালানো, রিক্সা চালানো, পরিবারগুলোর বিপদাপন্নতা বেড়ে যায়। সামাজিক রীতিনীতি ও স্থানীয় সংগঠনগুলো দুর্বল হলে বা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসমুখি না হলে ঐ জনগোষ্ঠীর বিপদাপন্নতার মাত্রা বেশি হয়।

জ্ঞান, সচেতনতা ও দক্ষতা- আপদের ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে যাদের জ্ঞান আছে তারা বিপদের শুরুতেই বিপদ এড়ানোর চেষ্টা করে, যেমন- ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা পাওয়ার সাথে সাথে তারা আশ্রয়কেন্দ্র বা নিরাপদ স্থানে সরে যায়। সচেতন ব্যক্তি বা পরিবার দুর্যোগ মোকাবেলা পরিকল্পনা করতে পারে ও পূর্বপ্রস্তুতি নিতে পারে। এদের বিপদাপন্নতা কম। সবল শরীর ও জীবনমুখি দক্ষতা, যেমন- সাঁতার কাটা, গাছে চড়া, মানুষকে আপদের হাত থেকে বাঁচতে সাহায্য করে। কম বয়সী শিশু, বৃদ্ধ পুরুষ বা নারী, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ও অসুস্থ ব্যক্তির শারীরিক শক্তি সাধারণত কম থাকে, এদের অনেকেই সাঁতার কাটতে বা গাছে চড়তে পারেনা। ফলে, এরা বেশি মাত্রায় বিপদাপন্ন থাকে।

২.৪.১. নারীর বিপদাপন্নতা

প্রথাগত কারণে নারী শারীরিক শক্তি ব্যবহারে পুরুষের তুলনায় কম পটু। তারা গাছে চড়তে পারেনা বা সাঁতার কাটতে পারেনা। তাদের পরিধেয় পোশাক বিপদের সময় চলাফেরা ব্যাহত করে। এগুলো তাদের বিপদাপন্নতার কারণ। তবে, নারীর বিপদাপন্নতার মূলে রয়েছে সমাজে তার অধস্তন অবস্থান। প্রচলিত প্রথা ও সামাজিক বৈষম্য নারীর যে ভূমিকা নির্ধারণ করে দিয়েছে তার ফলেই উদ্ভব হয়েছে এই অবস্থান। সমাজে বা পরিবারে নারীর মতামতের উপর তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়না; সিদ্ধান্ত নেবার অধিকার একেবারেই নাই। ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে দক্ষতা বা চিন্তা ভাবনা নারী বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারেনা। পরিবারের উপর নির্ভরশীলতার কারণে নারী ঝুঁকিপূর্ণ পরিস্থিতিতে জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। তদুপরি, নারীর নিজস্ব আয়ের সুযোগ তেমন নাই; নিজের বা পরিবারের সম্পদের উপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ থাকেনা।

এজন্য তারা দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের জন্য বিনিয়োগও করতে পারেনা। নারীর চলাফেরার উপর নানাবিধ সামাজিক বিধিনিষেধ আছে। নারীর সাঁতার কাটা, গাছে চড়া বা দৌড় ঝাঁপ করা সামাজিকভাবে ভাল চোখে দেখা হয়না। তাই, বেশিরভাগ নারী এসব দক্ষতা অর্জন করতে পারেনা; দুর্যোগের সময় তারা বিপদে পড়ে। বিশেষ করে গরিব পরিবারে, নারীর শিক্ষা, চিকিৎসা ও পুষ্টি সংক্রান্ত বিষয় কখনই অগ্রাধিকার তালিকায় স্থান পায়না। ফলে, নারীর চিন্তা চেতনা ক্ষুদ্র গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে- সে সচেতন হতে পারেনা। সেই সাথে, শারীরিকভাবেও সে দুর্বল থাকে। তার পক্ষে দুর্যোগ মোকাবেলা করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে।

গৃহস্থালি সামলানো ও শিশুর পরিচর্যা বিশেষভাবে নারীর উপর বর্তায়। আপদকালীন সময়ে ঘরদোর অগোছালো বা অরক্ষিত রেখে অথবা শিশুদের ফেলে রেখে একা একা নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়া নারীর পক্ষে সম্ভব হয়না। জরুরি তথ্য বা সংবাদ সে সময়মত পায়না এমনকি, ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তাও তার কাছে ঠিকমত পৌছায়না।

২.৫. ঝুঁকি বিবেচনা

জাতীয় পর্যায়ে ঝুঁকি বিবেচনায় জীবনহানী, উৎপাদন হ্রাস ও সেবাসমূহের বিঘ্ন প্রাধান্য পেয়েছে

আয়ের উৎস রক্ষা করাই ঝুঁকি মূল্যায়নে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর প্রধান বিবেচ্য

গরীব পরিবার তাৎক্ষণিক খাদ্য প্রাপ্তির জন্য ভবিষ্যতের অন্য ঝুঁকি মেনে নেয়

দুর্যোগের সময়ে পুনরুৎপাদনমূলক কাজগুলো নিশ্চিত করাই নারীর ঝুঁকি বিবেচনার মূল বিষয়

ঝুঁকি বিবেচনার সাথে গ্রহণযোগ্য ঝুঁকি মাত্রার ধারণা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সম্পদ, জ্ঞান ও প্রযুক্তিগত সীমাবদ্ধতার নিরিখে এই গ্রহণযোগ্য ঝুঁকির মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এর ভিত্তিতে বিভিন্ন ঝুঁকির গুরুত্ব ও ঝুঁকিহ্রাস কাজগুলোর অগ্রাধিকার নির্ধারণ করা হয়। জাতীয় পর্যায়ে, বিভিন্ন আপদে খাতওয়ারি অর্থনীতির ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করা হয়েছে ও ঝুঁকিহ্রাসের কাজ উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। স্থানীয় জনগোষ্ঠী উৎপাদনমুখি সম্পদের ঝুঁকিগুলো মুখ্য হিসাবে ধরে। কৌশল হিসাবে তারা প্রধানত নিজেদের ঝুঁকিহ্রাসকেই অগ্রাধিকার দেয়। পার্শ্ববর্তী এলাকায় এর প্রভাব কি হতে পারে তা বিবেচনায় আনেনা। পরিবারের জন্য মুখ্য হল বর্তমান খাদ্য নিরাপত্তা। এই ঝুঁকি নিরসনের জন্য পরিবার অন্য ঝুঁকিগুলো এর সদস্যদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে ও পরবর্তীকালের আরো অনেক ঝুঁকি তারা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করে। নারী পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকাকে অগ্রাধিকার দেয় ও এ সংক্রান্ত ঝুঁকি কমানোর জন্য সে নিজে অন্য অনেক ঝুঁকি নেয়। জীবনের ঝুঁকি- প্রধানত, ঘূর্ণিঝড় জনিত পূর্বপ্রস্তুতিমূলক কাজ ও গণসচেতনতার মাধ্যমে ও জনগোষ্ঠীর অন্যান্য ঝুঁকি অবশিষ্ট ঝুঁকি হিসাবে সাড়া প্রদানের মাধ্যমে নিরসন করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

২.৫.১. জাতীয় পর্যায়ে ঝুঁকি বিবেচনা

দুর্যোগ ঝুঁকি বিবেচনায় জীবন, উৎপাদন ও সেবা খাতসমূহের ঝুঁকি সম্ভাব্য সব আপদের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়েছে। আপদগুলো হল বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, নদী ভাঙ্গন, ভূমিকম্প, খরা, আর্সেনিক দূষণ, লবণাক্ততা, সুনামি, অগ্নিকান্ড, অবকাঠামো ভেঙ্গে পড়া ও ভূমিধ্বস। জলবায়ু পরিবর্তন বন্যা, ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, নদী ভাঙ্গন, খরা ও লবণাক্ততার তীব্রতা ও ধ্বংসকারিতা বাড়াবে ধারণা করে বিবেচনায় নেওয়া হয়েছে। দারিদ্র বিমোচন লক্ষ্যের আচ্ছাদনে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের উদ্দেশ্যগুলো নির্মাণ করা হয়েছে। এর ধারাবাহিকতায়, জাতীয় অর্থনীতি ও কৃষির প্রেক্ষিতে ঝুঁকি পর্যালোচনা করা হয়েছে। এই দুই বিষয়ে ক্ষতির পরিমাণ ও জলবায়ু পরিবর্তন জনিত কারণে উৎপাদনশীল জমির সম্ভাব্য হ্রাস অগ্রাধিকার নির্ণয়ে মুখ্য বিষয় হিসাবে ধরা হয়েছে। পরিকল্পনা দলিলে শৈত্য প্রবাহের উল্লেখ নাই; সম্ভবত, জাতীয় অর্থনীতির উপর শৈত্য প্রবাহের প্রভাব পরিমাপযোগ্য নয় বলে এই বিশ্লেষণ প্রয়োজন হয়নি। জাতীয় দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস পরিকল্পনায় প্রান্তিক ও সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর ঝুঁকিহ্রাস বিষয়ে কোন কিছু স্পষ্টভাবে নির্ধারণ করা হয়নি। নারীর বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট ঝুঁকির বিষয়েও এই পরিকল্পনা দলিলে কোন উল্লেখ নাই। তবে, দুর্যোগ ঝুঁকি সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচি ও অবশিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বা সাড়া প্রদান কার্যক্রম যথেষ্ট গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে। পরিকল্পনাভূক্ত স্থানীয় পর্যায়ে জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে ঝুঁকি নিরূপণ কার্যক্রম এই সচেতনতা বৃদ্ধি কর্মসূচির অংশ ও অবশিষ্ট ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বা সাড়া প্রদান কার্যক্রমের সাথে যুক্ত।

২.৫.২. স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ঝুঁকি বিবেচনা

দুর্যোগ প্রবণ এলাকায়, স্থানীয় জনগোষ্ঠী জীবিকার নিরাপত্তার প্রেক্ষিতে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যাখ্যা করে। একটি আপদের আঘাতে তাদের আয়ের উৎস কতটা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে সেটাই তাদের উদ্বেগের বিষয়। তাদের দৃষ্টিতে, ভৌত সম্পদ ও অবকাঠামো তাদের আয়ের উৎস সুরক্ষার সাথে জড়িত। তাই তাদের আঁকা ঝুঁকি মানচিত্রে বাঁধ, রাস্তা, খেয়াঘাট বা হাটবাজার প্রবলভাবে ফুটে ওঠে। নিজ এলাকার ঝুঁকি কমানোর জন্য আপদের ঝুঁকি অন্য এলাকায় স্থানান্তর করার কৌশল নিতে পারে। এই জন্য তারা স্থানীয় পর্যায়ে বাঁধ, নদী খনন, নদীর গতিপথ পরিবর্তনের প্রস্তাব রাখে।

২.৫.৩. পরিবার পর্যায়ে ঝুঁকি বিবেচনা

গরিব পরিবারের ক্ষেত্রে, সমকালীন খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকি বিবেচনার মূখ্য বিষয়। তাদের সম্পদ কম ও আয় অনিশ্চিত। ঝুঁকিহ্রাসের জন্য তারা খুব বেশি বিনিয়োগ করতে পারেনা। তারা দৈনন্দিন খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য ভবিষ্যতের বড় রকমের ঝুঁকি গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। তারা শিশুর শিক্ষা সংক্ষিপ্ত করতে পারে। পরিবারের চিকিৎসার খরচ কমাতে পারে। গৃহপালিত পশু বিক্রি করতে পারে। এমনকি, জমি বন্ধকও দিতে পারে।

২.৫.৪. নারীর ঝুঁকি বিবেচনা

নারীর ঝুঁকি মূল্যায়ন প্রধানত পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকাকেন্দ্রিক। ঝুঁকি মূল্যায়নের মুখ্য বিষয় হলো গৃহস্থালি সামগ্রী, পরিবারের দৈনন্দিন খাবার ও শিশু পরিচর্যা। আপদকালীন বা পরবর্তী সময়ে এসব বিষয়ে দায়িত্ব পালন করা কতটা অনিশ্চিত হতে পারে সেই বিবেচনায় নারী ঝুঁকি মূল্যায়ন করে। এই ঝুঁকিগুলো হ্রাস করতে গিয়ে অন্য যেসব ঝুঁকি তার সামনে আসে সেগুলো সে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করে। এই কারণে, স্বামীর অগোচরে সঞ্চয় করে; আশ্রয়কেন্দ্রে যেতে দেরি করে। ডুবন্ত অবস্থায় আব্রু ছাড়া সে ডাঙ্গায় উঠে আসতে পারেনা; সে হয়তো মনে করে, এটা তার মর্যাদা এমনভাবে ক্ষুন্ন করবে যে পুনরুৎপাদনমূলক ভূমিকায় সে আবার বহাল হতে পারবেনা।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ ঝুঁকি পরিবেশ ব্যবস্থাপনা

৩.১. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও নারী

বাংলাদেশ থেকে প্রাকৃতিক আপদ চিরতরে দূর করার কোন উপায় নাই। তবে আপদের সাথে নিত্য বসবাস করার ফলে এ দেশের মানুষ অনেক অভিজ্ঞতা অর্জন করেছে ও ঝুঁকিহ্রাস করার অনেক কৌশল রপ্ত করেছে। আপদের হাত থেকে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশ রক্ষা করার জন্য প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে এই কৌশলগুলো ব্যবহার করা হয়। এগুলো নারীর জীবন ও জীবিকাকে প্রভাবিত করে। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে নারী সরাসরি কমই অংশগ্রহণ করে। তবে, পারিবারিক পর্যায়ে এসব কাজে নারী জড়িত হয়।

বিভিন্ন পদক্ষেপের মাধ্যমে আপদের আঘাতের তীব্রতা ও ক্ষয়ক্ষতির মাত্রা কমানো যেতে পারে। এই ক্ষয়ক্ষতি কমানো বা প্রশমন কাজ ভৌত কাঠামো, যেমন- বন্যা নিরোধ বাঁধ তৈরির মাধ্যমে হতে পারে; আবার, নানাবিধ সামাজিক কর্মসূচি, যেমন- ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ বা গণ সচেতনতা ও ঝুঁকি পরিহারমূলক আচরণ গড়ে তোলার মাধ্যমেও হতে পারে। সাধারণত প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে ভৌত কাঠামো নির্মাণ করা হয়। বেসরকারি সংগঠনের মাধ্যমে গণসচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করা হয়। এছাড়া, দুর্যোগকালীন সময়ে জীবন ও সম্পদ রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন ধরণের প্রস্তুতিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়। এই পূর্বপ্রস্তুতি প্রাতিষ্ঠানিক, সামাজিক ও পারিবারিক পর্যায়ে হয়ে থাকে। প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক পর্যায়ে সতর্ক সংকেত প্রদান, উদ্ধার, স্থানান্তর ও সাড়া প্রদান সময়মত ও সুষ্ঠুমত করার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হয়ে থাকে। আর, পারিবারিক পর্যায়ে প্রস্তুতির মধ্যে রয়েছে বাড়িভিটা উঁচু করা, ঘর মেরামত করা, আলগা চুলা তৈরি করা, জ্বালানি ও শুকনো খাবার সংগ্রহ করে রাখা। পারিবারিক এই প্রস্তুতিমূলক কাজগুলোতে নারী বিশেষ ভূমিকা রাখে।

> "আগাম গৃহীত ঝুঁকিহ্রাস কৌশল শুধুমাত্র কোটি কোটি টাকাই সাশ্রয় করেনা লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনও রক্ষা করে থাকে। বর্তমানে ত্রাণ এবং পুনর্বাসনের জন্য যে অর্থ ব্যয় করা হয় সেটা যদি সমতা ভিত্তিক ও স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হত তাহলে যুদ্ধ ও দুর্যোগের ঝুঁকিহ্রাস করার ক্ষেত্রে তা সহায়ক ভূমিকা পালন করত"
>
> *কফি আনান, প্রাক্তন মহা-সচিব, জাতিসংঘ*

৩.২. প্রতিরোধ ও প্রশমন

ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, নদী ভাঙ্গন বা ভূমিকম্পের মত আপদ কখনই প্রতিরোধ করা যায়না। প্রাকৃতিক নিয়মে এর উদ্ভব হয়। আর এর প্রভাবে জীবন, সম্পদ ও পরিবেশের ক্ষয়ক্ষতি হয়। প্রশমন বা ক্ষতি কমানোর জন্য সামাজিক কর্মসূচি নেওয়া হয় বা ভৌত কাঠামো নির্মাণ করা হয়। প্রচলিত ভৌত কাঠামো ভিত্তিক প্রশমন কাজের মধ্যে অন্যতম হল বাঁধ বা বেড়িবাঁধ নির্মাণ, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা নির্মাণ, সেচ প্রকল্প বা ব্যারেজ নির্মাণ। ভৌত কাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দুর্যোগ প্রশমনের কাজ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে, সাধারণত বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের সহায়তায় করা হয়ে থাকে। অনেক সময় বেসরকারি সংস্থা এসব কাজে জড়িত হয়। আবার জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান, দক্ষতা ও সচেতনতা সৃষ্টি ও বনায়নের মাধ্যমেও দুর্যোগ প্রশমনের চেষ্টা করা হয়। সাধারণত, বেসরকারি সংস্থাগুলো এই ধরণের সামাজিক কর্মসূচি পরিচালনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

৩.২.১. প্রাতিষ্ঠানিক প্রশমনমূলক কাজ

ক. বাঁধ নির্মাণঃ বন্যাপ্রবণ নদীর তীর বরাবর উঁচু মাটির বাঁধ দেওয়া হয় যাতে নদীর পানি উপচিয়ে তীরবর্তী এলাকা প্লাবিত করতে না পারে। এর ফলে মাঠের ফসল ও লোকালয়ের বাড়িঘর বন্যার ক্ষয়ক্ষতি থেকে রেহাই পায়। উপকূল অঞ্চলে বিস্তীর্ণ এলাকার চারপাশ ঘিরে বেড়ি বাঁধ দেওয়া হয়। ঐ এলাকায় লোনা পানি ঢুকতে পারেনা; ফলে চাষাবাদ করা সম্ভব হয়। হাওর এলাকায় ডুবো বাঁধ দেওয়া হয়; এরফলে, হঠাৎ বন্যার হাত থেকে ঐ এলাকার ফসল বাঁচানো সম্ভব হয়। বাঁধ নির্মাণের পর প্রথম কয়েক বছর বেশ ভাল ফল পাওয়া যায়।

তবে, বাঁধের কারণে পলি জমে নদীর গভীরতা কমে যেতে পারে বা বাঁধবন্দি এলাকায় জলাবদ্ধতা দেখা দিতে পারে। পরবর্তীকালে ক্রমে ক্রমে বাঁধগুলো দুর্বল হয়ে যায়; তখন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খুব ব্যয়বহুল পড়ে। এমন অবস্থায় বাঁধ ভেঙ্গে মারাত্মক বন্যা দেখা দিতে পারে। বাঁধ তৈরির সময় দিনমজুরের কাজের সুযোগ হয়; নারীও এসময়ে শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে পারে। তবে বাঁধ নির্মাণের ফলে নারী স্বাভাবিকভাবে যেসব উন্মুক্ত এলাকা ও জলাশয় থেকে সম্পদ সংগ্রহ করত সেসব জায়গা চাষের আওতায় চলে আসতে পারে ও নারীর সুযোগ অনেক কমে যেতে পারে।

খ. সেচ প্রকল্প বা ব্যারেজ: খরা প্রবণ অঞ্চলে চাষাবাদ নিশ্চিত করার জন্য এসব প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। প্রকল্প এলাকায় বিভিন্ন ধরণের ফসল উৎপাদন সম্ভব হয়। সেচের সুবিধা পেলে কৃষক, বিশেষ করে সচ্ছল কৃষক, বাণিজ্যিক ফসল উৎপাদনের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে। ধান, গম বা কালাই বাদ দিয়ে তারা আঁখ, পাট বা তামাকের আবাদ শুরু করতে পারে। ফলে, এলাকার ফসল চক্রে পরিবর্তন আসতে পারে। তখন নারীর বিশেষ করে, গরিব পরিবারের নারীর জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আসতে পারে। খাদ্য শস্য বা দানা শস্য উৎপাদনে নারীর কাজের সুযোগ থাকে, কিন্তু বাণিজ্যিক ফসল চাষে নারীর কাজের সুযোগ তেমন থাকেনা। তাছাড়া, বাণিজ্যিক ফসলের জন্য জমি ব্যবহার হলে মাঠে গরুছাগল চরানো বা ফসল কুড়ানোর সুযোগ থাকেনা। এরফলে, দুর্যোগকালীন সময়ে গরিব পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হতে পারে। আর, এর প্রভাব সরাসরিভাবে এসে পড়ে ঐ পরিবারের নারীর উপর। ব্যারেজ বা সেচ প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হল কৃষিকাজের জন্য পানির প্রাপ্তি নিশ্চিত করা। একটি এলাকায় যদি সামগ্রিকভাবে পানির পরিমাণ কম থাকে, আর সেই পানি যদি শুধু ফসল আবাদের জন্য নিয়ে নেওয়া হয় তাহলে খাবার পানির সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিতে পারে। এরকম অবস্থা হলে গরিব পরিবারের নারী খুব অসুবিধায় পড়ে। তখন খাবার পানি আনার জন্য নারীকে অনেক দূরে যেতে হয়, বেশি সময় ব্যয় করতে হয়, বেশি পরিশ্রম করতে হয়। তাছাড়া, বাড়ি থেকে দূরে যেতে হয় বলে যৌন হয়রানির ঝুঁকিও বেড়ে যায়।

গ. ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র ও কিল্লা: ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় আশ্রয় নেবার জন্য উপকূলবর্তী লোকালয়ে খুব মজবুত পাকা দালান তৈরি করা হয়। ঝড়ের সতর্ক সংকেত দেওয়া হলে স্থানীয় জনসাধারণ ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে গিয়ে আশ্রয় নেয়। ঝড়ের সময় নারী ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় নিয়ে নিজের ও ছেলেমেয়ের জীবন বাঁচাতে পারে। তবে, ঝড়ের সময় ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া ও সেখানে থাকা নারীর জন্য খুব কষ্টকর। তাছাড়া, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্রে বেশি জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়া যায়না।

কিল্লা হল মাটির তৈরি উঁচু একটি জায়গা। গ্রামের লোকেরা সবাই মিলে, এনজিও বা সরকারী সহায়তায় এটা বানায়। ঘূর্ণিঝড়ের সময় গরুছাগল ও হাঁসমুরগি এখানে রাখা হয়।

ঘ. বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র: বন্যাপ্রবণ এলাকায় গ্রামের মাঝখানে মাটি ফেলে খানিকটা জায়গা উঁচু করে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করা হয়। বন্যায় বাড়িঘর পানিতে ডুবে গেলে লোকজন এখানে এসে আশ্রয় নেয়। বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র পানিতে ডোবেনা, ফলে এখানে নারী কিছুটা স্বস্তি পায়। তবে, নিজের বাড়ি ছেড়ে এসে অনেক লোকের ভিড়ে থাকতে হয় বলে বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রে নারী অনেক রকম অসুবিধা ভোগ করে।

ঙ. গ্রাম রক্ষা বেষ্টনী: হাওর অঞ্চলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তায় সামাজিকভাবে বসতি এলাকায় শক্ত দেওয়াল তৈরি করা হয়। এরফলে বসত এলাকা ভাঙ্গনের হাত থেকে রেহাই পায় ও পরিবারগুলোর দুর্যোগ ঝুঁকি কমে। এসব পরিবারের নারীর পক্ষে বন্যা মৌসুমে স্বাভাবিক কাজকর্ম করা ও নিজস্ব সবজি বাগান রক্ষা করা সহজ হয়।

চ. বনায়ন: সাধারণত উপকূল অঞ্চলে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে প্রকল্পের মাধ্যমে বনায়ন করা হয়। অনেক সময় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানও উপকূল বা অন্যান্য এলাকায় সামাজিক বনায়নের কাজে অংশ নেয়। বনায়ন পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। উপকূল অঞ্চলে প্যারাবন বেড়িবাঁধ ও জনবসতির উপর ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের আঘাতের তীব্রতা কমাতে পারে। বনায়নের ফলে নারীর পক্ষে জ্বালানি সংগ্রহ করা ও বনজ সম্পদের উপর নির্ভর করে পরিবারের খাদ্য নিরাপত্তা বজায় রাখার সুযোগ হয়।

ছ. সামাজিক কর্মসূচি: এর উদ্দেশ্য হল ঝুঁকি সম্পর্কিত জ্ঞান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করা ও এর মাধ্যমে জনগোষ্ঠীর মধ্যে ঝুঁকি পরিহারমূলক আচরণের অভ্যাস গড়ে তোলা। এর জন্য সমাজভিত্তিক ঝুঁকি নিরূপণ, জনশিক্ষামূলক প্রচারণা, উঠান বৈঠক করা হয়। এর মাধ্যমে নারী দুর্যোগ ঝুঁকি ও করণীয় সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে ও সচেতন হতে পারে।

ঝ. নীতি ও বিধিমালা: সরকারী পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি কমানোর জন্য অনেক ধরণের নীতি ও বিধিমালা সৃষ্টি করা হয়। যেমন- ইমারত নির্মাণ বিধিমালা ও ভূমি ব্যবহার নিয়ন্ত্রণবিধি। এগুলো দুর্যোগের তীব্রতা ও ক্ষতি কমানোর লক্ষ্যে প্রণয়ন করা হয়।

৩.২.২. পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে প্রশমন

বন্যাপ্রবণ এলাকায় পরিবারগুলো নিজ বাড়ির ভিটা উঁচু করে। অবস্থাপন্ন পরিবারগুলো দিনমজুর লাগিয়ে এই কাজ করে, আর কম স্বচ্ছল পরিবার নিজেদের শ্রমেই ভিটা উঁচু করে। নিজেদের শ্রমে ভিটা উঁচু করার সময় পরিবারের নারীকে তার দৈনন্দিন কাজ করার পরও অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। অনেক সময় বসতির সব পরিবার মিলে স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে পুরো বসত এলাকা উঁচু করে। হাওর এলাকাতেও এই ব্যবস্থার প্রচলন আছে। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে বসত এলাকা উঁচু করার সময় সব পরিবারের নারীকে দৈনন্দিন কাজ করার পরও অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়। নারীর নিজস্ব প্রশমনমূলক কাজ সম্পর্কে বেশি কিছু জানা যায়না। তবে, নারী ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা ঝুঁকি প্রশমনের কাজে লাগায়; যেমন- ঋণের টাকা দিয়ে ঘরে কংক্রিটের খুঁটি লাগায়। নিয়মিত 'মুষ্ঠিচাল' জমা করে আপদকালীন খাদ্যমজুত গড়ে তোলে ও পাড়াপড়শির সাথে সামাজিক সম্পর্কজাল তৈরি করে।

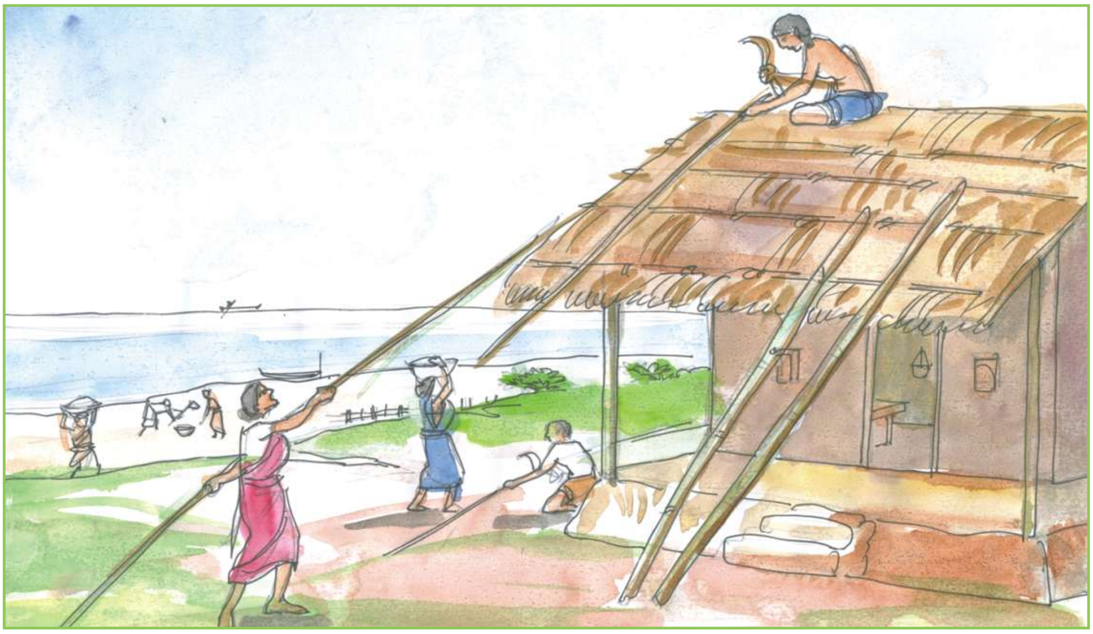

৩.৩. অভিযোজন

জলবায়ু পরিবর্তন দুর্যোগকে আরো তীব্র ও মারাত্মক করে তুলছে। এই পরিবর্তন ও দুর্যোগে টিকে থাকার জন্য মানুষ বিভিন্ন ধরণের অভিযোজন কৌশল ব্যবহার করে। স্থানীয় জনগণ নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে অভিযোজনের চেষ্টা করে। কৃষিক্ষেত্রে অভিযোজনের জন্য সরকারিভাবে অনেক প্রকল্প নেওয়া হয়। বিভিন্ন এনজিও প্রাতিষ্ঠানিক ও লোকায়ত অভিযোজন কৌশল প্রচার ও প্রসার করতে সাহায্য করে।

মূলত: অভিযোজনের ক্ষেত্রে নারী এবং তার পরিবারকে প্রাধান্য দেয়া হয়ে থাকে কিন্তু সেখানেও পরিবারের, জীবন ধারণের জন্য নারীর আয় রোজগারের ব্যাবস্থার কথা চিন্তা করা হয়ে থাকে। নারীর কৌশলগত চাহিদাকে কিভাবে পূরণ করা যাবে তা চিন্তা করা হয় না।

কৃষিক্ষেত্রে অভিযোজনের উদাহরণ

- **শস্য বহুমুখীকরণ-** প্রচলিত শস্য ছাড়াও আরো অনেক নতুন জাতের ফসলের আবাদ করা। এরফলে দুর্যোগে এক ফসলের ক্ষতি হলে অন্য ফসল আবাদ করে ক্ষতি পুষিয়ে নেবার সুযোগ থাকে।
- **দুর্যোগ সহনশীল শস্য-** বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনিস্টিটিউট ও কৃষি অধিদপ্তর বন্যা সহনশীল ধান, খরা সহনশীল ধান ও লবণাক্ততা সহনশীল ধান উদ্ভাবন ও প্রসারের ব্যবস্থা করছে। এসব আবাদের মাধ্যমে কৃষক পরিবার দুর্যোগে ফসলের ক্ষতি কমাতে পারবে।
- **স্বল্প মেয়াদী ও আগাম জাতের ধান-** দুর্যোগ মৌসুমের আগেই এই ফসল তোলা যায় বলে এর ঝুঁকি কম।
- **ভাসমান সবজি ক্ষেত-** জলাবদ্ধ এলাকায় ভাসমান সবজি একটা স্থানীয় অভিযোজন। বর্তমানে এনজিওরা এর প্রসার ঘটাচ্ছে।

এসব অভিযোজনের মাধ্যমে ধানের আবাদ নিশ্চিত হলে গরিব পরিবারের নারী ফসল তোলার সময় ও ধান ঝাড়াই মাড়াই করার কাজে শ্রমিক হিসাবে কাজ করার সুযোগ পায়।

পানি ব্যবস্থাপনায় অভিযোজনের উদাহরণ

- **রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং-** লবণাক্ত দূষণ এলাকায় বৃষ্টির পানি ধরে রেখে তা সারা বছর ব্যবহার করা হয়। তবে পরিবারের জন্য এটা একটা ব্যয়বহুল পদ্ধতি। তাছাড়া বর্ষা মৌসুমের পানি সংগ্রহ করে তা দিয়ে সারা বছরের পানির চাহিদা মিটানো সম্ভব হয়না।
- **পন্ড স্যান্ড ফিল্টার-** লবণাক্ত এলাকায় যেখানে নলকূপের মাধ্যমে সুপেয় পানি পাওয়া যায় না সেখানে এই পদ্ধতিতে পুকুরের পানি শোধন করে ব্যবহার করা হয়। তবে শীতকালে যখন পুকুরের পানি শুকিয়ে যায় তখন এই ব্যবস্থা আর কার্যকর থাকেনা।
- **আর্সেনিক ফিল্টার-** যেসব এলাকায় নলকূপের পানিতে আর্সেনিক দূষণের মাত্রা বেশি সেখানে এই ধরনের ফিল্টার ব্যবহার করা হয়। তবে এসব ফিল্টারের কার্যকারিতা সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

সাধারণত এনজিও'র মাধ্যমে এসব অভিযোজনের প্রচার ও প্রসার ঘটছে। নিরাপদ ও সুপেয় পানির প্রাপ্যতা বাড়লে নারীর বিশেষ সুবিধা হয়।

বিকল্প জীবিকার উদাহরণ

চিংড়ি চাষ ও কাঁকড়া চাষ- দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলে কৃষক চিংড়ি চাষকে অভিযোজন হিসাবে গ্রহণ করেছে। এই অভিযোজন অবস্থাপন্ন কৃষকের মাধ্যমে প্রসার লাভ করেছে। অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক হলেও এটা পরিবেশের প্রতি হুমকিস্বরূপ। তবে অতি গরিব পরিবারের নারী চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করে ও তা বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করার সুযোগ পায়। একইভাবে, লবণাক্ত এলাকায় কাঁকড়া চাষের প্রচলন হয়েছে। গরিব পরিবারের নারী কাঁকড়া চাষ করে আয় করতে পারে।

৩.৪. দুর্যোগ প্রস্তুতি

দুর্যোগ প্রস্তুতি থাকার লাভ হলো- প্রথমত এই প্রস্তুতি আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার ও দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণে রাখার সামর্থ্য বাড়াতে সাহায্য করে। এর ফলে, দুর্যোগের প্রভাব হ্রাস পায় ও মানবিক সাহায্যের চাহিদাও কম হয়। দ্বিতীয়ত দুর্যোগ প্রস্তুতি সাড়া প্রদানের সামর্থ্য বৃদ্ধি করে ও যখন সাড়া প্রদান জরুরি হয়ে পড়ে তখন তা সময়মত, কার্যকর ও মানসম্মতভাবে করা যায়।

৩.৪.১ প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি

দ্রুত ও সময়মত সতর্ক সংকেত প্রদান, উদ্ধার ও স্থানান্তর করা ও সাড়া প্রদানের জন্য দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো অনেক রকম প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম হাতে নেয়। এর মধ্যে অন্যতম হল ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত প্রচার ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও শক্তিশালী করা, যেমন- উপকূল অঞ্চলে ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি পরিকল্পনা। তারা জরুরি প্রস্তুতি পরিকল্পনা তৈরি করে। সংস্থাগুলো নিজ নিজ কর্মী বাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেয়, যাতে তারা কার্যকরভাবে দুর্যোগকালে কাজ করতে পারে। এছাড়া সরঞ্জাম সংগ্রহ করে, যেমন- উদ্ধার কাজের জন্য নৌকা ও ত্রাণ সামগ্রী মজুত করে। উদ্ধার ও স্থানান্তরের কাজ নারীবান্ধব করার জন্য প্রশিক্ষণে বিশেষ বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকে। তবে বাস্তবক্ষেত্রে সময় ও সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে এসব কাজ ঠিক নারীবান্ধব রূপ পায়না।

৩.৪.২. সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি

বিশেষ করে এনজিও ও সরকারি সহায়তায় সামাজিক পর্যায়ে যেসব প্রস্তুতিমূলক কাজ করা হয় তার উদ্দেশ্য হল দুর্যোগকালীন সময়ে জীবন ও সম্পদের ক্ষতি কমানো ও মানুষের দুর্দশা লাঘব করা। এই কাজের মধ্যে আছে স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন ও স্বেচ্ছাসেবী দল গঠন। এদের মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ করা হয় ও দুর্যোগ মোকাবেলার জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। কমিটির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবী দলের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয় ও মহড়া দেওয়া হয়। এছাড়াও উদ্ধার, স্থানান্তর ও সাড়া প্রদানের জন্য সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হয়। এসব কাজে নারী অংশগ্রহণ করে। ফলে, নারী একদিকে যেমন জ্ঞান, দক্ষতা ও সচেতনতা বাড়াতে পারে, অন্যদিকে সে তার মতামত অন্যদের জানানোর সুযোগ পায়। তবে ঘরসংসারের সব দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত এই দায়িত্ব তাকে নিতে হয়।

নাটোর জেলাধীন সিংড়া উপজেলার কলম গ্রামে বন্যার সময় বাঁধে ফাটল দেখা দিলে সরকারি লোক কখন আসবে তার জন্য অপেক্ষা না করে গ্রামবাসী নিজেরাই বাঁধের ক্ষতিগ্রস্ত স্থান মেরামতের উদ্যোগ গ্রহণ করে। বালির বস্তা, বাঁশের চাঁচ, বাঁশ, ইট, পাথর, কাঠের গুঁড়ি যা পাওয়া যায় তাই দিয়ে তারা বাঁধ মেরামত করেছিল।

উৎস: ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যদের জন্য দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস প্রশিক্ষণ মডিউল, একশনএইড বাংলাদেশ

৩.৪.৩. পারিবারিক পর্যায়ে দুর্যোগ প্রস্তুতি

পারিবারিক পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক কাজে নারী বিশেষ ভূমিকা রাখে। দুর্যোগের সম্ভাব্য অসুবিধার কথা বিবেচনা করে নারী আলগা চুলা তৈরি করে, জ্বালানি সংগ্রহ করে, শুকনো খাবার, যেমন- চিড়া, মুড়ি বা সবজি শুটকি মজুত করে। নিজের আয় থেকে কিছু টাকা জমিয়ে রাখে। পাটের সিকা বানায় যাতে বন্যার সময় ঘরের জিনিসপত্র ঘরের ভিতর উঁচুতে ঝুলিয়ে রাখা যায়। দুর্যোগের ক্ষতি কমানোর জন্য বাড়ির চারপাশে ঢোলকলমি ও কলা গাছ লাগায়। এছাড়াও পুরুষের সাথে ঘর মেরামতের কাজ করে, মাচা বানায়, কলা গাছের ভেলা তৈরি করে। এসব করার জন্য পরিবারের নারীকে তার নিজের সব কাজ করার পর অতিরিক্ত শ্রম দিতে হয়।

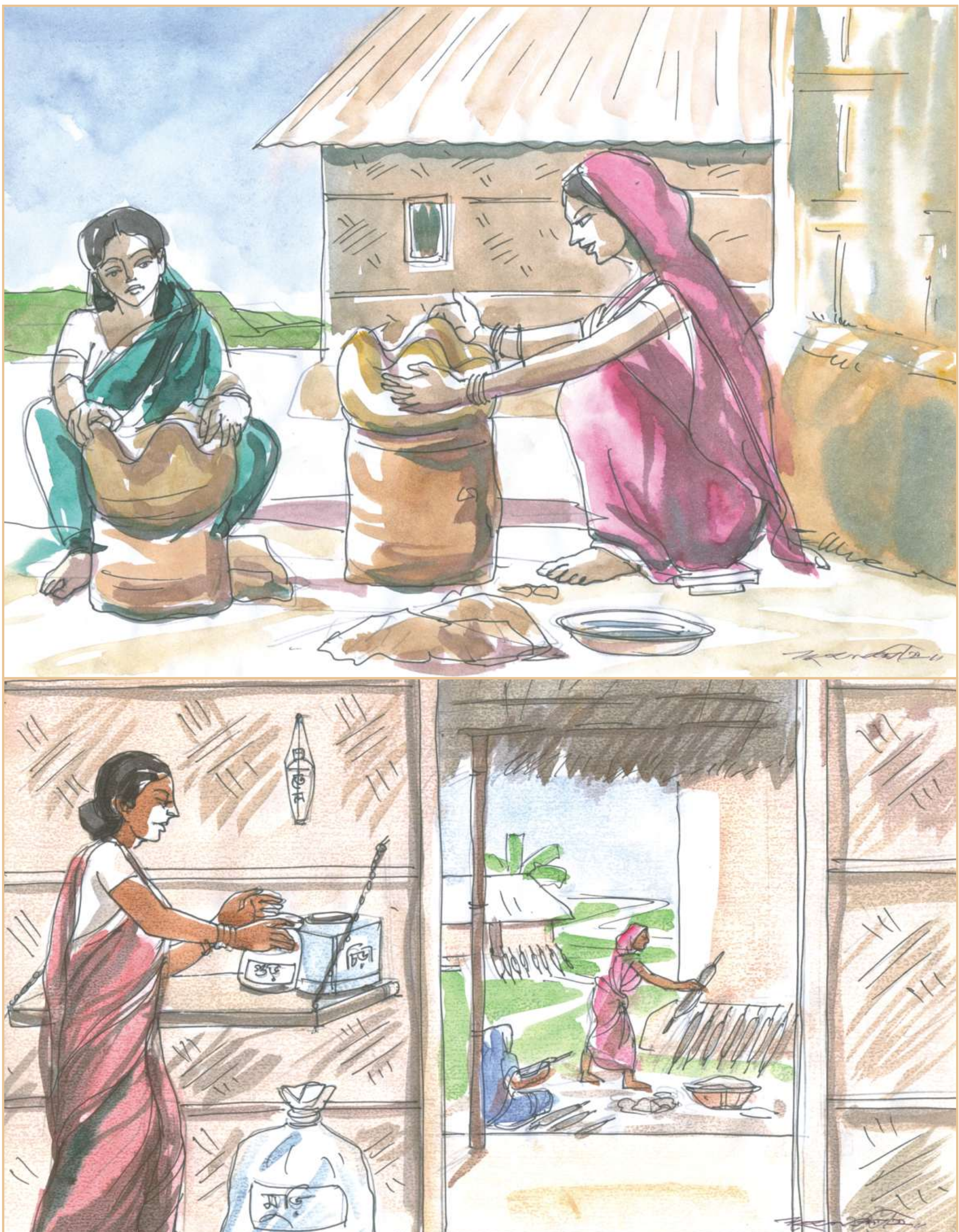

চতুর্থ অধ্যায়ঃ জরুরি অবস্থায় সাড়া প্রদান

৪.১. দুর্যোগে সাড়া ও নারী

দুর্যোগ জীবনহানি ঘটায়, মানুষকে স্থানচ্যুত করে ও তাদের জীবিকার উৎস ধ্বংস করে দেয়। তবে দুর্যোগের প্রভাবে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর নারীরা বেশিমাত্রায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রথাগত অধস্তন অবস্থান ও অর্থনৈতিক সম্পদের উপর অধিকারহীনতার কারণে নারীর দুর্যোগ ঝুঁকি অনেক বেশি। যেকোনো দুর্যোগের সময় নারীর এই ঝুঁকিগুলো দৃশ্যমান হয়[৩]:

- যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে হতাহতদের মধ্যে নারীর সংখ্যাই থাকে বেশি। নারী ও পুরুষ সম্পর্কে আলাদা আলাদা তথ্য বেশি পাওয়া যায়না; তবে যেসব পাওয়া গেছে তাতে দেখা গেছে যে, পুরুষের তুলনায় নারী অনেক বেশি সংখ্যায় মারা গেছে। ১৯৯১ সালের সাইক্লোনে নারীর মৃত্যুহার পুরুষের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি।
- দুর্যোগকালীন সময়ে নারীর স্বাস্থ্যসেবা বেশি দরকার হয় কিন্তু সে সেবা প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। লিঙ্গ পার্থক্যের কারণে নারীর যেসব বিশেষ স্বাস্থ্যসেবা দরকার হয় দুর্যোগকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে তা দেওয়া কঠিন হয়। সে সময় নারী চিকিৎসাকর্মী পাওয়া যায়না; তাছাড়া প্রথাগত বৈষম্যের কারণে চলমান সেবাগুলো তার কাছে পৌঁছায়না।
- দুর্যোগপীড়িত পরিবারে নারীর কাজের বোঝা বেড়ে যায়। এ সময়ে আশ্রয়হীন ও সম্বলহীন হয়ে পড়লেও নারীকে তার দৈনন্দিন সাংসারিক কাজগুলো ঠিকমত করতে হয়। যেমন- খাবার সংগ্রহ করা, রান্না করা ও শিশু পরিচর্যা করা।

দুর্যোগের সময় নারীর ঝুঁকি

- মৃত্যু হার বেশি
- অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্যসেবা
- কাজের বোঝা বৃদ্ধি
- সহায়-সম্বল হারায়
- ত্রাণ সহায়তায় বঞ্চনা
- নির্যাতনের শিকার
- প্রাতিষ্ঠানিক সাড়াপ্রদানে অংশগ্রহণ থাকেনা

- নারীর অর্থনৈতিক বিপদাপন্নতা দুর্যোগের সময় অনেক বেড়ে যায়। সম্পদের উপর নারীর নিয়ন্ত্রণ খুব বেশি থাকেনা; তার এই স্বল্প সম্পদ দুর্যোগের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
- নারী খুবই অপর্যাপ্ত পরিমাণে ত্রাণ সহায়তা পায়। নারীকে পরিবারের প্রধান উপার্জনকারী হিসাবে দেখা হয়না; এজন্য নারীর চাহিদা বিবেচনা করে ত্রাণ সামগ্রী নির্ধারণ করা হয়না। তাছাড়া, নারীর চলাফেরার উপর সামাজিক বিধিনিষেধ থাকার কারণে সে প্রয়োজনমত ত্রাণ সংগ্রহ করতে পারেনা।
- দুর্যোগকালীন সময়ে নারীর লিঙ্গ ভিত্তিক নির্যাতনের ঝুঁকি বেড়ে যায়। দুর্যোগের সময় সামাজিক সুরক্ষা দুর্বল হয়ে পড়ে, ফলে, এ সময় নারীরা বেশি মাত্রায় যৌন হয়রানি ও নিপীড়নের শিকার হয়।
- নারীরা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজে অংশগ্রহণ করতে পারেনা। যদিও দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীতে নারীই সর্বপ্রথম সাড়া প্রদান শুরু করে, তবুও প্রথাগত বৈষম্যের কারণে প্রাতিষ্ঠানিক ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনায় নারীকে যুক্ত করা হয়না।

দুর্যোগে, প্রাতিষ্ঠানিক বা লোকায়ত, কোন সাড়াই নারীর এসব ঝুঁকিগুলোকে লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে গণনা করেনা। নারী সময়মত সতর্কবার্তা পায়না; অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে নিরাপদ স্থান বা অস্থায়ী আশ্রয়ে যাবার সুযোগ পায় সবার শেষে। জরুরি অবস্থায় নারীর প্রয়োজন খুব কমই বিবেচনা করা হয়। নিরাপদ স্থান ও আশ্রয়কেন্দ্রের পরিকল্পনা করার সময় নারীর বিশেষ প্রয়োজন ও তার বহুমাত্রিক সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বের বিষয়গুলো প্রাধান্য পায়না। ত্রাণ কার্যক্রমে নারীর গোপনীয়তা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা, স্বাস্থ্যকর পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা স্থান পায়না। পুনর্বাসন কার্যক্রম মূলত অর্থনৈতিক কাজগুলো বিবেচনা করে। নারীর সামাজিক ও পারিবারিক ভূমিকা অর্থনৈতিক মানদণ্ডে মাপা হয়না; নারীর এসব কাজ পুনর্বাসন কার্যক্রমের আওতায় আসেনা। ফলে নারী বঞ্চনার শিকার হয়।

৪.২. সতর্ক সংকেত ও পূর্ব সতর্কতা

আপদের সম্ভাবনা দেখা দিলে সতর্ক সংকেত প্রচার করা হয়। সতর্ক সংকেতের মাধ্যমে মানুষ জানতে পারে কোন আপদ কখন ও কোথায় আঘাত হানতে পারে। এরফলে তারা সময় থাকতে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে পারে। তবে এরকম সতর্ক সংকেত শুধুমাত্র ঘূর্ণিঝড়ের ক্ষেত্রেই দেওয়া হয়, অন্যান্য আপদের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা নাই। শৈত্য প্রবাহের সময় তাপমাত্রা কমে যাওয়ার পূর্বাভাস দেওয়া হয়। বন্যা মৌসুমে প্রধান নদীগুলোর নির্দিষ্ট কয়েকটি স্থানে পানির উচ্চতা হ্রাস-বৃদ্ধির তথ্য দেওয়া হয়। এতে জনগোষ্ঠীর উপর আপদের সম্ভাব্য প্রভাব সম্পর্কে তেমন কিছু বোঝা যায়না। বর্তমানে অনেক এনজিও সমাজভিত্তিক বন্যা সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছে।

[৩] মানজারি মেহেতা ২০০৬

৪.২.১. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সতর্ক বার্তা প্রচার

আবহাওয়া বিভাগ থেকে প্রাপ্ত তথ্য রেডিও-টিভিতে প্রচার করা হয়। খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের অধীন ঘূর্ণিঝড় প্রস্তুতি কর্মসূচী (সিপিপি)[৪] জনগোষ্ঠী ভিত্তিক স্বেচ্ছাসেবক দলের নেটওয়ার্কের সহযোগিতায় সামাজিক পর্যায়ে ঘূর্ণিঝড় প্রবণ এলাকায় সতর্কবার্তা প্রচার করে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র ই-মেইল, ফ্যাক্স ও কুরিয়ারের মাধ্যমে পানির উচ্চতা সম্পর্কিত আগাম তথ্য সম্বলিত বুলেটিন প্রতিদিন বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও সংস্থায় প্রেরণ করে থাকে, জরুরি অবস্থায় এ বুলেটিন আরও দ্রুতভাবে প্রেরণ ও প্রচার করা হয়। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল এন্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস বিভিন্ন প্রধান নদীর ভাঙ্গন জনিত প্রধান প্রধান স্থানসমূহ সম্পর্কে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশ করে[৫]।

> **সার্বজনীন তথ্যের ক্ষেত্রে নারীদের অধিকার সীমিত**
>
> ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের সময় সতর্ক সংকেত এক পুরুষ থেকে আরেক পুরুষের মাধ্যমে এক স্থান হতে অন্য স্থানে সঞ্চারিত হয়েছিল। অর্থাৎ, নারীরা সরাসরি তথ্য পায়নি।
>
> *Genanet, 2004*

ঘূর্ণিঝড়ের সতর্ক সংকেত প্রচার ব্যাপকভাবে করা হয়। সমুদ্র বন্দরে বিপদ সংকেত দেয়া হলে সেখানে লাল পতাকা টাঙিয়ে দেয়া হয় এবং রেডিও টেলিভিশনে বার বার সতর্ক সংকেত প্রচার করা হয়। সাধারণত উপজেলা নির্বাহী অফিস, আবহাওয়া অফিস, উঁচু দালান, ইউনিয়ন পরিষদ ভবন ও উঁচু গাছে পতাকা উত্তোলন করে বিপদ সংকেত বোঝানো হয়। এছাড়া সরকারি কর্তৃপক্ষ মাইকিং এর মাধ্যমে প্রচারণা চালায় ও সাইরেন বাজায়। এছাড়া ঢোল বা টিন পিটিয়ে সতর্ক সংকেত গ্রামবাসীকে জানানো হয়। নারীর পক্ষে অনেক সময় সতর্ক সংকেত পাওয়া কঠিন হয়। গরিব পরিবারে রেডিও বা টিভি থাকেনা। বাড়ি প্রধান সড়ক থেকে দূরে হলে, গৃহস্থালি কাজে ব্যস্ত থাকলে বা বাতাস উল্টো দিকে বইলে নারী সতর্ক সংকেত শুনতে পায়না।

৪.২.২. সামাজিক পর্যায়ে সতর্ক বার্তা প্রচার

গ্রামের পুরুষরা হাটবাজারে যায়, চায়ের দোকানে বসে। তারা সহজেই সতর্ক বার্তা পায়। তাছাড়া, তাদের নিজেদের মধ্য সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা থাকে। একজন সতর্ক বার্তা পেলে, সে তা অন্যদের জানিয়ে দেয়। পেশাজীবী শ্রেণীর মধ্যে এই ব্যবস্থা বেশ চালু আছে। একজন মাঝি এরকম খবর পেলে তা অন্য মাঝিদের জানিয়ে দেয়। আজকাল মোবাইল ফোনের প্রচলন হওয়ার কারণে এই পদ্ধতির ব্যবহার বেড়েছে। তবে, এসব ব্যবস্থা নারীর জন্য খুব একটা প্রযোজ্য হয়না। নারী পাড়াপড়শির কাছ থেকে মৌখিকভাবে ঝড়ের সতর্ক বার্তা পেতে পারে।

৪.২.৩. পরিবার পর্যায়ে সতর্ক বার্তা প্রচার

পরিবারের কোন সদস্য রেডিও, টিভি থেকে সতর্ক বার্তা পেলে সে অন্যদের জানায়। বাড়ির বাইরে কেউ সতর্ক সংকেত শুনলে সে বাড়ি এসে অন্যদের জানায়। এতে অনেক সময় নষ্ট হয়। আবার, অনেক সময়, সে বাড়ি না এসে সরাসরি আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যায়। ফলে ঐ পরিবারের নারী বিপদের মধ্যে থাকে।

---

[৪]সাইক্লোন প্রিপেয়ার্ডনেস প্রোগ্রাম
[৫]মোঃ নুরুল হুদা, ২০১০

নারীবান্ধব পূর্বসতর্কতা ব্যবস্থার চারটি উপাদান

ঝুঁকি সচেতনতা

- ঝুঁকি নিরূপণের মাধ্যমে যথাযথভাবে নারীর ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা
- নারীর আপদ এবং বিপদাপন্নতাগুলো দেখা
- নারীর ক্ষেত্রে প্রভাবকগুলোর প্রবণতা দেখা
- নারীর ঝুঁকি সংক্রান্ত মানচিত্র এবং তথ্যের প্রাপ্যতা দেখা

পর্যবেক্ষণ ও সতর্কতা ব্যবস্থা

- নারীর আপদ এবং নারীবান্ধব সতর্ক সংকেত সংক্রান্ত পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নয়ন করা
- সঠিক নারীবান্ধব সূচক পর্যবেক্ষণ করা
- পূর্বাভাস দেয়ার সঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দেখা
- সতর্ক সংকেত সঠিকভাবে এবং সময়মত প্রস্তুত করতে পারছে কিনা তা দেখা

প্রচারণা এবং যোগাযোগ

- ঝুঁকি সংক্রান্ত তথ্য এবং সতর্ক সংকেত নারীদেরকে জানানো
- ঝুঁকিগ্রস্ত নারীর কাছে সতর্ক সংকেত পৌঁছায় কিনা তা দেখা
- নারীরা ঝুঁকি এবং সতর্ক সংকেত বুঝতে পারে কিনা তা দেখা
- সতর্ক সংকেত সংক্রান্ত তথ্যগুলো নারীর কাছে স্পষ্ট এবং ব্যবহারযোগ্য কিনা তা দেখা

সাড়াদান সামর্থ্য

- জাতীয় পর্যায়ে এবং কমিউনিটিতে সাড়াদানে নারীর সক্ষমতা তৈরি করা
- সাড়াদান পরিকল্পনা হালনাগাদ এবং পরীক্ষিত কিনা তা দেখা
- নারীর সক্ষমতা এবং জ্ঞান সাড়াদানের জন্য ব্যবহারযোগ্য কিনা তা দেখা
- নারীরা সতর্ক সংকেত অনুযায়ী সাড়া দিতে প্রস্তুত কিনা তা দেখা

৪.৩. স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার

ঘূর্ণিঝড়ের গতিপথের সকল বসতির জনগোষ্ঠীকে জীবন রক্ষার জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে হয়। সাধারণত উঁচু পাকা ভবন, যেমন- ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, স্কুল, সরকারি-বেসরকারি অফিস, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস বা প্রতিবেশীর পাকা বাড়ি আশ্রয়কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ঘূর্ণিঝড়ের সতর্কবার্তা জারি হওয়ার পরে স্থানান্তর শুরু হয় ও অল্প সময়ের মধ্যে অনেক লোককে নিরাপদ আশ্রয়ে সরে যেতে হয়।

৪.৩.১. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার

নিরাপদ স্থানে সরে যাবার জন্য ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, কিল্লা ও বন্যা আশ্রয়কেন্দ্রের ব্যবস্থা আছে (যদিও এদের সংখ্যা পর্যাপ্ত নয়)। তবে সংঘবদ্ধভাবে স্থানান্তর করার কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা এদেশে এখন পর্যন্ত গড়ে ওঠেনি। উপকূল এলাকায় এনজিও ও সিপিপি ভলান্টিয়াররা স্থানান্তরে সহায়তা করে। অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজে উপকূল এলাকায় সিপিপি ভলান্টিয়াররা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোষ্টগার্ড বঙ্গোপসাগরে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ চালায়। শহর এলাকায় আগুন লাগা, বহুতল ভবন ধ্বসে পড়া বা বড় রকমের দুর্ঘটনায় সামরিক বাহিনীর লোকেরা অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ চালায়।

পরিকল্পনা ও প্রশিক্ষণে নারীকে মর্যাদার সাথে স্থানান্তর ও উদ্ধার করার কথা বলা হলেও বাস্তবে প্রায়ই তা হয়না। উদ্ধার বা স্থানান্তর কালে নারী হয়রানি ও ভর্ৎসনার শিকার হয়।

৪.৩.২. সামাজিক পর্যায়ে স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার

পাড়াপড়শিরা অনেক সময় স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজে লিপ্ত হয়। অধিকাংশ সময়ে এটা বিশৃঙ্খলভাবেই চলে, আর এতে নারীর মর্যাদা রক্ষার বিষয়টা থাকে খুবই গৌণ।

বর্তমানে সরকারি ও এনজিওর সহায়তায় স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধারের জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক কাঠামো তৈরি করার চেষ্টা চলছে। স্থানীয় কমিটি, স্বেচ্ছাসেবী ও তাদের প্রশিক্ষণ এই কাঠামোর অন্তর্গত। এই ব্যবস্থায় নারীর অগ্রাধিকার ও মর্যাদা রক্ষার বিষয় খুব জোরালোভাবে এসেছে।

৪.৩.৩. পারিবারিক পর্যায়ে স্থানান্তর, অনুসন্ধান ও উদ্ধার

সাধারণত পরিবারগুলো নিজ উদ্যোগেই নিরাপদ স্থানে যায়। পরিবারের পুরুষ সদস্য এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় ও ব্যবস্থা করে। পুরুষ সদস্য অনুপস্থিত থাকলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় নারীর পক্ষে দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। প্রথমত, সে সময়মত সতর্কবার্তা পায়না; দ্বিতীয়ত, গৃহস্থালি সামগ্রী ঠিকমত গোছগাছ না করে বা সাথে না নিয়ে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া সম্ভব হয়না। তৃতীয়ত, স্বামীর অনুপস্থিতিতে বা বিনা অনুমতিতে নারী ঘর ছেড়ে অন্যত্র যেতে পারেনা। অনেক সময় আশ্রয়কেন্দ্র কোথায় ও সেখানে কিভাবে যেতে হবে তা সে জানেনা। তাছাড়া, ঝড়ের সময় চলাফেরা করা কষ্টকর ও বিপদজনক হয়ে পড়ে। নারী একা যেতে পারেনা; অন্য পুরুষমানুষের সাথে গেলে সে নানাবিধ ঝুঁকি, বিশেষ করে যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে। বন্যার সময় মানুষ নিজের বসতভিটায় অনেক চেষ্টার পরও যখন টিকে থাকতে পারেনা, তখন

সে নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। প্রবল বন্যায় ঘরের মেঝেতে পানি ওঠার পরও চৌকি উঁচু করে বা উঁচু মাচা বানিয়ে তারা নিজের ঘরেই বাস করার চেষ্টা করে। যখন এভাবে বাস করা সম্ভব হয়না তখন তারা নিকটবর্তী কোন উঁচু জমিতে আশ্রয় নেয় বা কোন আশ্রয়কেন্দ্রে চলে যায়। বন্যা আক্রান্ত পরিবারগুলো নিজ উদ্যোগেই নিরাপদ জায়গায় সরে যায়। বন্যার সময় নারীর জন্য স্থানান্তর একটা কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কারণ, তাকে খাবার, হাঁড়িপাতিল, জ্বালানি, চুলা ও হাঁসমুরগি সাথে নিয়ে যেতে হয় ও নতুন জায়গায় রান্নার ও থাকার ব্যবস্থা করতে হয়।

পরিবারের কেউ নিখোঁজ হলে নারীর পক্ষে অনুসন্ধান ও উদ্ধার কাজ চালানো বা তার ব্যবস্থা করা প্রায় অসম্ভব। সিডর আক্রান্ত অনেক পরিবারের নারী নিখোঁজ স্বামীর অনুসন্ধান চালাতে পারেনি ও এ ব্যাপারে নিষ্পত্তি না হওয়ার কারণে ঐসব নারী অনেক সুযোগ সুবিধা ও অনুদান থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

৪.৩.৪. আশ্রয়কেন্দ্রে নারীর ঝুঁকি

দুর্যোগের সময় আশ্রয়কেন্দ্রে না গিয়ে নিজের বাড়িতে থাকলে নারীর বিপদাপন্নতা অনেক বেড়ে যায়[১]। আবার আশ্রয়কেন্দ্রে নানাবিধ, বিশেষ করে যৌন হয়রানির ঝুঁকিতে পড়ে। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ের কোন কোন এলাকায় ঐ সংকটময় সময়েও ডাকাতি ও যৌন নির্যাতনের ঘটনা

[১]শাফী ২০০৮

ঘটেছে। সে সময়ে কিশোরী ও নারী অপহৃত ও যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিল[৭]। তাছাড়া, আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে নারীর বিশেষ চাহিদার কথা বিবেচনা করা হয়না। শতকরা ৬৫ ভাগ আশ্রয়কেন্দ্রে নারী ও পুরুষের থাকার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা নাই। নারী ও পুরুষের জন্য আলাদা পানি, পরিচ্ছন্নতা ও পয়ঃনিষ্কাশনের ব্যবস্থা নাই। এসব কারণে, আশ্রয়কেন্দ্রে নারী যৌন হয়রানি ছাড়াও আরও অনেক ভোগান্তির শিকার হয়।

৪.৪. ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

দুর্যোগের পরে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর উপর দুর্যোগের প্রভাব জানার জন্য ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়। ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের মাধ্যমে দুর্যোগের প্রভাব কতটা গভীর ও বিস্তৃত তা জানা যায়, যেমন- কতটা এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কতজন আহত বা নিহত হয়েছে, সম্পদ ও ভৌত কাঠামোর কতটা ক্ষতি হয়েছে। আর, আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর জীবন, মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও জীবিকা কি ধরণের ঝুঁকিতে আছে ও তাদের কোন ধরনের সহায়তা প্রয়োজন তা জানার জন্য চাহিদা নিরূপণ করা হয়। ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের উপর নির্ভর করে পুরো ত্রাণ বিতরণ ও পরবর্তী কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়। সামাজিক ও পরিবার পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের বিধিবদ্ধ কোন ব্যবস্থা নাই। প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের সময় সমাজের প্রভাবশালী ব্যক্তিরা তাদের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ জানায়। একইভাবে, পরিবারগুলোও তাদের ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ যখন যেভাবে সুযোগ হয় জানায়।

৪.৪.১. প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

সরকারী পর্যায়ে 'এসওএস ফরম' এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে ক্ষয়ক্ষতি ও তাৎক্ষণিক চাহিদা নিরূপণের জন্য দ্রুত জরিপ করা হয় এবং দুর্যোগ ঘটার এক ঘণ্টার মধ্যে এই তথ্য টেলিফোনে বা বেতারের মাধ্যমে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানো হয়। 'এসওএস ফরম' এর মাধ্যমে আনুমানিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত লোকসংখ্যা, বিধ্বস্ত বাড়ি এবং মৃতের সংখ্যাও জানানো হয় এবং কি ধরণের সাহায্য প্রয়োজন তা জানানো হয়, যেমন- অনুসন্ধান ও উদ্ধার, প্রাথমিক চিকিৎসা, পানীয় জল, তৈরি খাবার, জামা কাপড় এবং জরুরি আশ্রয়। 'এসওএস ফরম' এর মাধ্যমে দ্রুত জরিপের পর বাংলাদেশ সরকারের প্রণীত 'ডি ফরম' এর মাধ্যমে ইউনিয়ন পর্যায়ে বিশদ ও অবিরত জরিপ করা হয় এবং উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণ কক্ষে পাঠানো হয়। বিশদ জরিপ সাধারণত এক মাসের মধ্যে সম্পন্ন করা হয়। এরপর অবিরত জরিপ করা হয় পরিবর্তন বোঝার জন্য। এর মাধ্যমে বিভিন্ন সময়ের তুলনামূলক চিত্র বিশ্লেষণ করে ভবিষ্যতের করণীয় সম্পর্কে সুপারিশমালা প্রদান করা হয়। 'ডি ফরম'এর মাধ্যমে খাত ভিত্তিক ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণ করা হয়, যেমন- ক্ষতিগ্রস্ত লোকের সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা, ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি, গবাদিপশু, হাঁসমুরগী, ফসল, লবণ, চিংড়িঘের, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, সড়ক, বাঁধ, বন, বিদ্যুৎ, তার ও টেলিযোগাযোগ, শিল্প কারখানা, মৎস্য খামার, নলকূপ, পুকুর ও জলাশয়, নৌকা, ট্রলার, মাছ ধরার জাল, তাঁত প্রভৃতি। এই ফরম্যাট সংকলনের মাধ্যমে ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের উপর ভিত্তি করে ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রসমূহ নির্ধারণ করা হয়। সঠিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের উপর নির্ভর করে পুরো ত্রাণ বিতরণ কর্ম পরিকল্পনা। বিভিন্ন এনজিও জরুরি ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করে থাকে। 'ডিইআর ফরম' এর মাধ্যমে এনজিওরা ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করে। এখানে নারীদের চাহিদা ও ক্ষয়ক্ষতি কিছুটা উল্লেখ করা হয়েছে।

সঠিকভাবে চাহিদা নিরূপণ না হলে ত্রাণ অকার্যকর

১৯৯৫ সালের বন্যায় ত্রাণ হিসেবে শুকনো ও রান্না করা খাবার দেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সঠিকভাবে চাহিদা নিরূপণ না হওয়ায় ত্রাণ হিসেবে চাল, ডাল, লবণ, তেল ইত্যাদি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রান্না করার ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেককেই না খেয়ে থাকতে হয়েছে। আশ্রয়কেন্দ্রের জন্য অস্থায়ী ল্যাট্রিন, পানি বিশুদ্ধ করার জন্য ফিটকিরি, আশ্রয়কেন্দ্র পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখার জন্য ব্লিচিং পাউডার, চাহিদা নিরূপণে না আসার কারণে আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে অনেকেই ডারিয়ায় আক্রান্ত হয়। রাস্তার ও বেড়িবাঁধের উপর আশ্রিত ব্যক্তিদের অস্থায়ী আশ্রয়ের জন্য পলিথিনের চাহিদা না আসার কারণে তাদেরকে খোলা আকাশের নিচে বসবাস করতে হয়।

(উৎস: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ২০০৬, অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম)

৪.৪.২. নারীর ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ

পারিবারিক অর্থনীতিতে নারী যথেষ্ট অবদান রাখে; সামগ্রিকভাবে, এই অবদান জাতীয় অর্থনীতিতে সঞ্চারিত হয়। তবে নারীর এই অবদান আর্থিক মানদণ্ডে মাপার ব্যবস্থা নাই। ফলে, জাতীয় অর্থনীতিতে এর প্রতিফলন দেখানো যায়না। সবজি বাগান, হাঁসমুরগি পালন, ক্ষুদ্র সঞ্চয় ও নিজের জ্ঞান, দক্ষতা ও পরিশ্রমের দ্বারা নারী গার্হস্থ্য ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠু ও সচল রাখে। এগুলোর উপর দুর্যোগের বিরূপ প্রভাব পড়ে। কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের সময় এসব বিষয় আমলে নেওয়া হয়না। ফলে, নারীর বিশেষ চাহিদাগুলো সম্পর্কে জানা যায়না ও সেগুলো পূরণ করার ব্যবস্থা করা হয়না।

[৭]কাফী ১৯৯২

৪.৫. খাপ খাওয়ানো ও টিকে থাকা

দুর্যোগ আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর পক্ষে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ফিরে আসার জন্য বাইরের সাহায্য দরকার হয়। তবে বাইরের সাহায্য বা ত্রাণ পৌঁছাতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ৩ বা ৪ দিন লেগে যায়, কোন কোন ক্ষেত্রে ১ সপ্তাহ বা তারও বেশি সময় লাগে। এ সময়ে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী নিজেদের প্রচেষ্টাতেই বেঁচে থাকে ও জীবনযাত্রা চালায়। তাছাড়া, প্রায়শঃই বাইরের সাহায্য প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হয়। দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী বার বার দুর্যোগে আক্রান্ত হয়; ফলে, দুর্যোগ মোকাবেলা করা বা দুর্যোগ কালীন সময়ে টিকে থাকা ও জীবনধারণ করার অভিজ্ঞতা অর্জন করে ও কৌশল রপ্ত করে। এই অভিজ্ঞতা ও কৌশলের সাহায্যে তারা দুর্যোগ পরিস্থিতিতে টিকে থাকে।

৪.৫.১. দুর্যোগে টিকে থাকায় নারীর ভূমিকা

দুর্যোগ কালে আক্রান্ত পরিবারগুলো ব্যবহারিক ও উৎপাদনমুখি অনেক সম্পদ হারায়; তাদের আয়ের উৎসগুলো সচল থাকেনা। পুরুষ পরিবার প্রধান ত্রাণ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত থাকে ও এলাকায় বা এলাকার বাইরে কাজের সন্ধানে ঘোরাঘুরি করে। এসময়ে পরিবারের সকলের পুষ্টি, স্বাস্থ্য, পানি, পরিচ্ছন্নতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব নারীর উপর এসে পড়ে। এছাড়াও, সমাজে পরিবারের অবস্থান ও মর্যাদা ঠিক রাখার দায়িত্বও তাকে নিতে হয়। এগুলো সে করে তার নিজস্ব জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশল ব্যবহারের মাধ্যমে। এছাড়াও, এজন্য সে তার সামাজিক সম্পর্কজাল কাজে লাগায়। পরিবার পরিচালনায় নারীর এই নেতৃত্ব গ্রহণ ও পরিবারকে সচল রাখার জন্য নারীর নিজস্ব কৌশলগুলো সচরাচর গোচরে আসেনা[৮]।

৪.৫.২. পরিবারের জীবনধারণ প্রচেষ্টা

দুর্যোগপীড়িত পরিবারের জীবনধারণ প্রচেষ্টায় যেসব কৌশল দৃশ্যমান সেগুলোর মধ্যে রয়েছে[৯] -

- **কৃচ্ছতা সাধন:** মজুত সম্পদ বা খাদ্য দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করার জন্য নিয়মিত দৈনিক ব্যবহার কমানো। তারা কম পরিমাণে খাবার খায়; দুই বেলার জায়গায় এক বেলা খায়। এক্ষেত্রে নারীর কৃচ্ছতা বেশি হয়, কারণ, পরিবারের অন্য সবাইকে খাইয়ে, সবার পরে সে নিজে খায়।

- **ঝুঁকি সময়ান্তর:** বর্তমান প্রয়োজন মেটানোর জন্য ভবিষ্যতের ঝুঁকি নেওয়া। যেমন- গৃহস্থালি সামগ্রী বিক্রি করা, অগ্রিম শ্রম বিক্রি করা, উচ্চ সুদে ধার নেওয়া।
- **দায়িত্ব পুনর্বন্টন:** পরিবারের শিশুকে শ্রমে নিয়োজিত করা; কাজের সন্ধানে পুরুষ সদস্যের অন্যত্র চলে যাওয়া।
- **ঘাটতি পূরণ:** উন্মুক্ত এলাকা, জলাশয় বা বনভূমি থেকে খাদ্য সংগ্রহ; আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে সাহায্য নেওয়া ও ত্রাণ সংগ্রহ করা। এসব প্রচেষ্টার কারণে নারীর উপর অনেক চাপ পড়ে। কৃচ্ছতার কারণে তার পুষ্টি ঘাটতি হতে পারে। গৃহস্থালি সামগ্রী বিক্রি করার জন্য সাংসারিক কাজ করা তার জন্য কষ্টকর হয়। উন্মুক্ত এলাকা, জলাশয় বা বনভূমি থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার কাজে সে যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে। পুরুষ সদস্য অন্যত্র চলে গেলে তার বিবিধ ঝুঁকি, বিশেষ করে যৌন নির্যাতনের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

[৮] খুরশীদ ২০০৮
[৯] জাহিদ ২০০৮

৪.৬. জরুরি ত্রাণ ও চিকিৎসা

ত্রাণ কার্যক্রম একটি মানবিক পদক্ষেপ। দুর্যোগে আক্রান্ত জনগণের কাছে নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী ও সেবা (খাদ্য, বাসস্থান, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ইত্যাদি) পৌঁছানো জরুরি ত্রাণ কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণত, সরকারি পর্যায়ে ও বিভিন্ন এনজিওর মাধ্যমে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে জরুরি ত্রাণ বিতরণ করা হয়ে থাকে। এই ত্রাণ বিতরণ প্রাথমিক ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণের উপর নির্ভরশীল। অনেক সময় সমাজের বিত্তবানরা ব্যক্তিগত পর্যায়ে ত্রাণ বিতরণ করে। এক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপণ করা বা উপকারভোগী নির্বাচনে কোন নিয়মনীতি ব্যবহার করা হয়না।

৪.৬.১. লক্ষ্যভূক্তিকরণ ও নারী

দুর্যোগে মানবিক সাহায্য হিসেবে দুর্যোগপীড়িত সকল পরিবার বিবেচনায় আনা জরুরি। তবে সকল পরিবারের চাহিদা এক রকম নয়। চাহিদার এই ভিন্নতা ও প্রাপ্ত সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য লক্ষ্যভূক্তিকরণ কৌশল প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপকতা ও পরিবারের সক্ষমতা বিচার করে উপকারভোগী নির্বাচন করা হয়। বাংলাদেশে প্রায় সকল ত্রাণ কার্যক্রম দাতা নির্ভর। আর, প্রয়োজনের তুলনায় সম্পদ পাওয়া যায় খুবই কম। দাতা বা ত্রাণ বিতরণকারী সংগঠন নিজস্ব নিয়মনীতি ও প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবারভিত্তিক অগ্রাধিকার তালিকা তৈরি করে। তবে প্রায় সব ক্ষেত্রে হতদরিদ্র, নারী প্রধান, তালাকপ্রাপ্তা, বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী সদস্য আছে এমন পরিবারকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

৪.৬.২. ত্রাণ সামগ্রী ও নারীর চাহিদা

ত্রাণ হিসাবে যেসব সামগ্রী দেওয়া হয় তা মোটামুটি নিম্নরূপ-

- **শুকনো খাবার:** চিড়া, মুড়ি, গুড়, বিস্কুট, চকলেট
- **খাদ্য:** চাল, গম, আটা, ডাল, তেল, লবণ, আলু
- **পানি:** বিশুদ্ধ পানি, বোতল জাত পানি, পানি বিশুদ্ধকরণ বড়ি, ব্লিচিং পাউডার, ফিটকিরি, জেরিকেন
- **ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা:** গোসলের সাবান, কাপড় কাঁচা সাবান, স্যানিটারি ন্যাপকিন
- **পোশাক:** শাড়ি, লুঙ্গি, গামছা, বাচ্চার পোশাক
- **গৃহস্থালি সামগ্রী:** প্লেট, গ্লাস, হাঁড়িপাতিল, চামচ, মগ, বালতি, ম্যাচ, মোমবাতি, কেরোসিন, হারিকেন, জ্বালানী কাঠ
- **আশ্রয়:** পলিথিন শিট, ত্রিপল, কম্বল

ত্রাণ বিতরণে নারীর বিশেষ চাহিদা প্রায়ই স্পষ্টভাবে নিরূপণ করা হয়না। জরুরি ভিত্তিতে, দ্রুত ও অল্প সময়ের মধ্যে চাহিদা নিরূপণ ও ত্রাণ বিতরণ পরিকল্পনা করতে হয় এই অজুহাতে নারীর বিশেষ চাহিদা নির্ধারণ করা হয়না। তবে, এ বিষয়ে মানবিক সাহায্য সংস্থাগুলোর আগ্রহ আছে বলা যেতে পারে। কারণ, নারীর জন্য কিছু সামগ্রী তারা বিতরণ করে, যেমন- ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা ও গৃহস্থালি সামগ্রী।

৪.৬.৩. ত্রাণ বিতরণে নারীর সুবিধা অসুবিধা বিবেচনা

ত্রাণ সামগ্রী প্রদানের সময় নারীর সুবিধা অসুবিধা খুব একটা বিবেচনা করা হয়না। উপকারভোগী হিসাবে নাম থাকলে, নারীকে বিতরণ কেন্দ্রে এসে ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ করতে হয়। একটা কেন্দ্র থেকে অনেক জনকে ত্রাণ সামগ্রী দেওয়া হয় বলে সবাইকে বিতরণ কেন্দ্রে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়। এসব কেন্দ্রে সাধারণত প্রস্রাব পায়খানার ব্যবস্থা থাকেনা। তাছাড়া, অনেক পুরুষের সাথে ত্রাণ নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করা নারীর জন্য অসুবিধাজনক। অনেক সময় ত্রাণ বিতরণ কেন্দ্রে নারীর মর্যাদাহানিকর ঘটনা ঘটে। তবে আজকাল অনেক সংস্থা নারীর সুবিধা অসুবিধার কথা বিবেচনা করছে ও ত্রাণ বিতরণ নারীবান্ধব করার চেষ্টা করছে। অনেক সময় ত্রাণ হিসাবে নগদ অর্থ দেওয়া হয়। কখনও কখনও নগদ অর্থ ত্রাণ হিসাবে না দিয়ে 'কাজের-বিনিময়ে-অর্থ' হিসাবে দেওয়া হয়। 'কাজের-বিনিময়ে-অর্থ' নারীর জন্য খুবই অসুবিধাজনক। দুর্যোগকালীন অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংসারের সব কাজের সাথে, অতিরিক্ত এই কাজ করতে হয়।

৪.৬.৪. জরুরি চিকিৎসা সহায়তা

দুর্যোগে মানুষের মৃত্যু ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ছাড়াও আহত হতে পারে বা আঘাতজনিত সংক্রমণে ভুগতে পারে। তাছাড়া, দুর্যোগকালীন সময়ে বিভিন্ন রোগ ছড়াতে পারে; যেমন- জ্বর, স্বর্দিকাশি, শ্বাসতন্ত্রের প্রদাহ, বিভিন্ন প্রকার চর্মরোগ, ডায়রিয়া, পোড়া, পাকস্থলীর সমস্যা ইত্যাদি। জরুরি সাড়ার অংশ হিসেবে এ সময়ে আক্রান্ত জনগণকে জরুরি চিকিৎসা সহায়তা প্রদান করা হয়ে থাকে। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসক দল, আউটরিচ ক্লিনিক বা বিশেষ ক্লিনিকের মাধ্যমে এসব স্বাস্থ্যসেবা দেয়। সম্পদের সীমাবদ্ধতা, যোগাযোগ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক চিকিৎসাকর্মী না পাওয়ার কারণে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই সেবার পরিমাণ হয় খুবই অপ্রতুল। তাছাড়া, নারীর বিশেষ চাহিদা, যেমন- প্রজনন স্বাস্থ্যসেবা ঐ সব পদ্ধতিতে দেওয়া কঠিন।

ভাবী শিশুর জন্য উদ্বেগ

মঠবাড়িয়া উপজেলার সাপলেজা ইউনিয়নের কলুবাড়ি গ্রামের সন্তানসম্ভবা বেগম ঘূর্ণিঝড়ের রাতে বাঁচার জন্য নিজেকে একটি গাছের সাথে বেঁধে রেখেছিলেন। এখন (চাহিদা নিরূপণের সময়) তলপেটে ব্যথার কারণে তিনি বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেননা। তার গর্ভের সন্তান নড়াচড়া করছেনা। ডাক্তারের কাছে যাওয়ার মতো অর্থও তার কাছে নাই। নিজে বেঁচে থাকলেও তার এই ভাবী শিশু পৃথিবীর আলো দেখবে কিনা তা নিয়ে তিনি খুব দুশ্চিন্তায় আছেন।

Source: Rapid Gender Assessment of SIDR Response, 2007, Care Bangladesh

৪.৭. জরুরি পুনর্বাসন

জরুরি পুনর্বাসন হল সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত অত্যাবশ্যকীয় সেবাসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় নিয়ে আসার প্রচেষ্টা। এটা অপেক্ষাকৃত দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম যার মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে প্রাতিষ্ঠানিক ও জনগণের সুযোগ সুবিধাসমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসতে সক্ষম হয়। এই পর্যায়ে এমন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়, যাতে দুর্যোগপীড়িত জনগোষ্ঠী পুনরায় স্বাভাবিকভাবে জীবন যাপন করতে পারে। এসব কাজ জনগোষ্ঠীকে স্বাভাবিক কাজকর্ম পুনরায় শুরু করতে, অর্থনৈতিক কার্যক্রমে ফিরে আসতে ও মানসিক ও সামাজিক নিরাপত্তা ফিরে পেতে সাহায্য করে।

৪.৭.১. প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসন ও নারীর চাহিদা

প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে পুনর্বাসন কাজগুলো হয় খাতওয়ারি হিসাবে। গুরুত্বপূর্ণ খাতসমূহ হল[১০]

- **খাদ্য নিরাপত্তা:** কৃষি ও জীবিকার অন্যান্য উৎসগুলো স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে সক্ষম না হওয়া পর্যন্ত খাদ্য বিতরণ জারি রাখা; ভিজিডি ও ভিজিএফ কর্মসূচি চালানো; বাজার ব্যবস্থার মাধ্যমে খাদ্যশস্যের সরবরাহ ও মূল্য ঠিক রাখা;
- **পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন:** নলকূপ স্থাপন, পুকুর খনন ও গণ শিক্ষা মূলক কার্যক্রম;
- **আবাসন:** দুঃস্থ ও দরিদ্র পরিবারে আর্থিক সহায়তা প্রদান ও ব্যাংকের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী আবাসন ঋণ সরবরাহ;
- **স্বাস্থ্য ও পুষ্টি:** চিকিৎসাকেন্দ্র মেরামত করা, যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা, গ্রাম পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবিকা নিয়োগ ও তাদের প্রশিক্ষণ ও গণ শিক্ষামূলক কার্যক্রম;
- **গ্রামীণ অবকাঠামো:** বাঁধ, রাস্তা, কালভার্ট ও ব্রিজ মেরামত ও নির্মাণ;
- **নৌ পরিবহন:** জেটি, পন্টুন, ফেরি ও নৌযান মেরামত ও সংস্কার;
- **বিদ্যুৎ:** অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও সঞ্চালন লাইন মেরামত ও পুনঃস্থাপন করা;
- **টেলিযোগাযোগ:** অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি মেরামত ও পুনঃস্থাপন করা;
- **শিক্ষা:** অবকাঠামো মেরামত ও নির্মাণ; আসবাব ও শিখন সামগ্রী সরবরাহ;
- **জীবিকা:**
  - কৃষি উপকরণ, বীজ, সার, কীটনাশক সুলভে সরবরাহ করা, সুদ বিহীন কৃষি ঋণ প্রদান;
  - অনুদান হিসাবে গবাদিপশু সরবরাহ;
  - গরু, ছাগল বা মুরগির খামারের জন্য ঋণ প্রদান;
  - নদী ও সমুদ্রে মাছ ধরার জন্য যন্ত্রপাতি ও উপকরণ (যেমন- নৌকা, ট্রলার, জাল) অনুদান হিসাবে সরবরাহ করা, মৎস্য খামার ও চিংড়িঘেরের জন্য ঋণ সরবরাহ করা;
  - ছোট ব্যবসা ও কারখানার জন্য অনুদান বা ঋণ সহায়তা;

[১০]সিডর রিপোর্ট ২০০৮

- **বনায়ন:** সামাজিক বনায়ন, সবুজ বেষ্টনী গড়ে তোলা, ক্ষতিগ্রস্ত বনভূমি সংরক্ষণ।

প্রাতিষ্ঠানিক পুনর্বাসনে বিনিয়োগের খুব কম পরিমাণই নারীর বিশেষ চাহিদা মেটাতে সক্ষম হয়। এর কারণ হল, প্রথাগতভাবে অর্থনীতিতে নারীর কাজকর্মের প্রতিফলন পরিমাপ করা হয়না। পুনর্বাসন বিনিয়োগ দৃশ্যমান অর্থনৈতিক খাতগুলো স্বাভাবিক ও সবল করার চেষ্টা করে; নারী যেসব কাজ করে সেগুলো এর অওতায় আসেনা। এখানে নারী বৈষম্যের শিকার হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে যে, কৃষিখাতে সহায়তা হিসাবে ঋণ বা ঋণের সুদ মওকুফ করা হয় ও সুদ বিহীন ঋণের ব্যবস্থা করা হয়, নারীর ক্ষুদ্রঋণ বা তার সুদ কখনো মওকুফ করা হয়না।

৪.৭.২. পরিবার পর্যায়ে পুনর্বাসন ও নারীর ভূমিকা

দুর্যোগের পরে নারী পুরুষ উভয়েই পুনর্বাসন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে থাকে। পরিবারের সবাই মিলে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়িঘর মেরামত করে। বন্যার পর কাদাপানির মধ্যে ও পিছল ভিটের উপর দাঁড়িয়ে নারী বাড়িঘর পরিষ্কার করে, উঠোন পরিষ্কার করে; পুরুষের সাথে একযোগে ঘর মেরামত ও নির্মাণের কাজ করে[১১]। বাড়িঘর মেরামতের জন্য অনেক সময় পরিবারের সম্পদ যেমন- জমি, গাছ, গরুছাগল বিক্রি করতে বা বন্ধক রাখতে হয়, সেই সাথে নারীকেও বিক্রি করতে হয় তার নিজস্ব সম্পদ, যেমন- গহনা। তাছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে পরিবার নারীর মাধ্যমে ঋণ সংগ্রহ করে ও নারীকে ঋণগ্রস্ত করে ফেলে।

[১১]নাসরীন, ২০০৬

পঞ্চম অধ্যায়ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকা

৫.১. ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারী

নারী ও পুরুষের কাজের মধ্যে এক ধরণের শ্রম বিভাজন আছে। প্রচলিত সামাজিক প্রথা এই শ্রম বিভাজন সৃষ্টি করে ও এতে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রকাশ পায়। সাধারণভাবে এই বিভাজন হল, আয়রোজগার করা আর পরিবারের ভরণপোষণ করা পুরুষের দায়িত্ব; আর গৃহস্থালি কাজ ও পরিবার পরিজনের পরিচর্যা করা নারীর দায়িত্ব। প্রচলিত সামাজিক প্রথাসমূহ এই শ্রম বিভাজন স্থায়ী ও পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে। ধারাবাহিক সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিশুকাল থেকেই মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুর আলাদা আলাদা কাজ নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়, যেমন- মেয়েরা ঘরের কাজ করবে আর ছেলেরা করবে বাইরের কাজ। বিভিন্ন বিধিনিষেধের মাধ্যমে শিশুর মনে শ্রম বিভাজনের ধারণা গড়ে তোলার চেষ্টা করা হয়। তাদের আচরণগুলো নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এর প্রতিফলন মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুর খেলাধুলা ও চলাফেরায় দেখতে পাওয়া যায়। যার ফলে তারা ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বেড়ে ওঠে এবং এটা তাদের মনে গভীরভাবে প্রথিত থাকে। পরবর্তীকালে তারা সহজে এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনা।

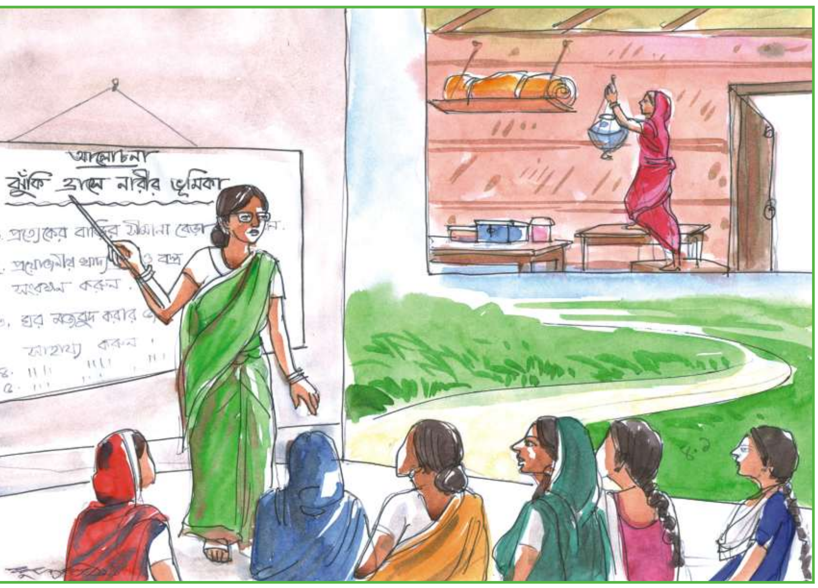

দুর্যোগের কারণে পরিবারের আয়ের উৎসগুলো বন্ধ হয়ে যায়। তখন পুরুষের আয়রোজগার করার সুযোগ থাকেনা। যদিও এ সময় নারীও তার সম্পদ ও কাজের সুযোগ হারায়, তারপরও এই সংকটে পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখা- পরিবারের পানি, খাবার ও পরিচর্যার দায়িত্ব এককভাবে নারীর উপর এসে পড়ে। নারী এটা করতে পারে কারণ পরিবার পালন ও দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা। তাছাড়া, সন্তান লালন পালন ও পরিজনের পরিচর্যা ছাড়াও উৎপাদনমূলক ও সামাজিক কাজে সে জড়িত থাকে, যেমন- বীজ সংরক্ষণ, হাঁসমুরগি পালন, সবজি বাগান করা ও সামাজিক সম্পর্কজাল তৈরি করা। এর মাধ্যমে সে অনেক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জন করে, অনেক কৌশল রপ্ত করে। এগুলো সে দুর্যোগের সময় কাজে লাগায়। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নারী পুরুষের শ্রম বিভাজনের পরিবর্তন বা নারীর মুখ্য ভূমিকা গ্রহণের বিষয়ে পরিবারে ও সমাজে স্বীকৃতি পায়না। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও এর কোন মূল্যায়ন করা হয়না।

৫.২. নারী পুরুষের শ্রম বিভাজন

নারী পুরুষের শ্রম বিভাজনের মূল ভেদ রেখা হল, যে সব সামাজিক কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায় সেগুলো পুরুষের এখতিয়ারে; আর যে সব কাজ অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে মাপা যায় না সেগুলো নারীর কাজ হিসাবে ধরা হয়। এই ধারণা এতই প্রবল যে, নারীর গৃহস্থালি কাজগুলো, যেমন- জ্বালানী সংগ্রহ করা, পানি আনা, রান্না করা, ঘরদোর পরিষ্কার করা বা সন্তানের যত্ন নেওয়া- এসব কাজের মূল্যায়ন করা হয়না। এমনকি, হাঁসমুরগি পালন ও সবজি বাগানের মাধ্যমে নারী যে আয় করে, সেগুলোও গণনার মধ্যে আনা হয়না। এই সামাজিক শ্রম বিভাজন একটা ধারণাগত বিষয়। বাস্তবক্ষেত্রে, অনেক নারী আয়রোজগারের জন্য শ্রমিক হিসাবে কাজ করে, ব্যবসাবাণিজ্যে জড়িত হয় কিংবা চাকরি করে। আবার, পুরুষদের কেউ কেউ গৃহস্থালি কাজ, যেমন- রান্না করা বা সন্তান প্রতিপালনে অংশ নেয়। তবে, প্রথাগত দৃষ্টিকোণ থেকে এটাকে বিচ্যুতি হিসাবে বিবেচনা করা হয়। এই শ্রম বিভাজনের বাইরে কোন কাজে লিপ্ত হওয়া নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য মর্যাদাহানিকর বলে মনে করা হয়। সমাজ এটা খুব ভালো চোখে দেখেনা। বিগত দুই দশকে বাস্তবক্ষেত্রে অনেক নারী উৎপাদন ও শ্রম বাজারে যুক্ত হয়েছে। গরিব পরিবারের নারী এখন শ্রমিক হিসাবে মাটি কাটে, ইটখোলায় কাজ করে, নির্মাণ কাজে অংশ নেয় বা পোশাক শিল্পে কাজ করে। লেখাপড়া জানা অনেক নারী সরকারি ও বেসরকারি অফিসে চাকরি করে। এ সত্ত্বেও, নারী পুরুষের শ্রম বিভাজনের ধারণায় এখন পর্যন্ত তেমন কোন মৌলিক পরিবর্তন আসেনি।

৫.৩. নারীর ঝুঁকি

অর্থনীতির মাপকাঠিতে নারী কোন অবদান রাখেনা এই ধারণা থেকে নারীকে পুরুষের বোঝা হিসাবে গণ্য করা হয়। নারীর অবস্থান হয় পুরুষের অধস্তন। তার কাজ ও চলাফেরার উপর নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। অর্থনৈতিক সম্পদের উপর তার মালিকানা থাকে খুবই কম। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার মতামত দেবার অধিকার থাকেনা। প্রথাগত সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়া নারীর ভূমিকা খুব নির্দিষ্ট ও সীমিত করে রাখে। সে বৈষম্য ও বঞ্চনার শিকার হয়। পরিবারে মেয়েশিশু শিক্ষা, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা কম পায়। সে নানাবিধ নিয়ন্ত্রণ ও বিধিনিষেধের মধ্যে থাকে। সে ছেলেশিশুর মত বাইরে যেতে পারেনা।

পরিবার বা সমাজ নারীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসের বিষয় গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেনা। দুর্যোগের সময়েও নারীর জীবন রক্ষার চেয়ে পরিবারের মর্যাদা বা সামাজিক বিধি রক্ষা অগ্রাধিকার পায়। বৈষম্যমূলক পরিবেশে বেড়ে ওঠার কারণে নারী জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা অর্জন করতে পারেনা যেমন- সে সাঁতার কাটা শিখতে পারেনা, গাছে চড়তে পারেনা ও শক্তি প্রয়োগমূলক কোন কাজে সে পটু হতে পারেনা। ফলে দুর্যোগের সময় সে বিপদে পড়ে। অনেক সময় জীবনও হারায়। আবার, অনেক সময় এই অদক্ষতার কারণে সে প্রকৃত অর্থেই পুরুষের বোঝা হয়ে পড়ে ও বৈষম্যমূলক সামাজিক ধারণাগুলো আরো বলবত করে।

লিঙ্গগত বৈশিষ্ট্যের জন্য স্বাভাবিক সময়েও নারী যৌন হয়রানি ও নির্যাতনের শিকার হয়। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নারীর এই ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়।

৫.৪. নারীর নেতৃত্ব

দুর্যোগ ঘটার পরপরই নারী সর্বপ্রথম সাড়া প্রদানে এগিয়ে আসে। দুর্যোগ জনিত দুর্দশা থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে সে পরিবারের সকল কাজের দায়িত্ব নেয়, সকলকে প্রভাবিত করে ও পরিচালিত করে। সে ভগ্নস্তূপ ও জঞ্জাল পরিষ্কার করে ও থাকার জায়গা ঠিক করে। ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঘরের জিনিসপত্র এক জায়গায় জড়ো করে। পরিবারের সবার জন্য পানি ও খাবারের ব্যবস্থা করে। আহত লোকজনের সেবাযত্ন করে। দুর্যোগের ফলে অর্থনৈতিক কাজকর্ম প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। পরিবারের পুরুষ আয়রোজগার হারায়। তখন তারা ত্রাণ সহায়তার উপর নির্ভর করতে বাধ্য হয়। ত্রাণ সহায়তা সাধারণত সময়মত এসে পৌঁছায়না। আর যেটুকু আসে তা পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত হয়না। এরকম অবস্থায় পুরুষ তার নির্ধারিত দায়িত্বগুলো পালন করতে পারেনা। তারা পরিবারের ভরণপোষণের সক্ষমতা হারিয়ে ফেলে। এই সংকটকালে পরিবারের সকলকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও রোগব্যাধির হাত থেকে বাঁচানোর দায়িত্ব নারীর উপর এসে পড়ে। নারী খুব স্বাভাবিকভাবেই এসব দায়িত্ব নেয়। সে পানি সংগ্রহ করে, খাবার জোগাড় করে, রান্না করে ও সন্তানের পরিচর্যা করে।

৫.৫. নারীর প্রতি বৈষম্য

দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীর প্রতি বৈষম্য খুবই প্রকট -

- সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নারীর জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা অর্জনের সুযোগ হরণ করা হয়, যার ফলে দুর্যোগকালে নারী জীবনহানির ঝুঁকিতে পড়ে।
- দুর্যোগ পরিস্থিতিতে পুরুষ পরিবারের ভরণপোষণ করতে পারেনা। পুরুষের এই অক্ষমতা সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য। সে ত্রাণের জন্য অপেক্ষা করতে পারে অথবা পরিবার পরিজন ফেলে রেখে অন্যত্র কাজের সন্ধানে যেতে পারে; কিন্তু সংকটকালেও নারী তার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পায়না। তাকে পরিবারের সবার জন্য রান্না ও খাবারের ব্যবস্থা করতে হয়।
- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে সমাজ ও পরিবারের অর্থনৈতিক সম্পদ রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকে। এর জন্য বিনিয়োগ করা হয় - বিশেষ করে নারী এ সব বিষয়ে শ্রম ও সময় দিয়ে থাকে। কিন্তু নারীর সম্পদ, যেমন- রান্নার সরঞ্জাম, জ্বালানী, হাঁসমুরগি বা সবজি বাগান রক্ষার বিষয়ে বিবেচনা করা হয়না। এগুলো নারীকে নিজ দায়িত্বেই করতে হয়।

- প্রথাগত আচরণে নারীর যে সব বিচ্যুতি পুরুষের উপকারে আসে, যেমন- স্বামীর অগোচরে সঞ্চয়, সমাজ ও পরিবারের কাছে সেগুলো সহনীয়, কিন্তু যে সব বিচ্যুতি সরাসরি পুরুষের উপকারে লাগেনা, যেমন- স্বামীর বিনা অনুমতিতে আশ্রয়কেন্দ্রে যাওয়া, সমাজ ও পরিবারের কাছে সেগুলো কম সহনীয়।
- দুর্যোগ সহায়তা হিসাবে পুরুষের ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ, বিশেষ করে কৃষি ঋণের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হয়- ঋণ বা সুদ মওকুফ করা হয়, কিন্তু নারী তার ক্ষুদ্র ঋণের ক্ষেত্রে কোন ছাড় পায়না।
- নারীই সর্বপ্রথম দুর্যোগে সাড়া দেয়; কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক সাড়া প্রদান কার্যক্রমের পরিকল্পনা বা ব্যবস্থাপনায় নারীকে জড়িত করা হয়না।
- দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণে নারীর নিজস্ব সম্পদগুলোর বিষয়ে কোন বিবেচনা করা হয়না।
- লক্ষ্যভূক্তিকরণে শর্ত হিসাবে নারীর উল্লেখ থাকে ও উপকারভোগী হিসাবে নারীর নাম থাকে। অনেক সময় নারীকে নিজে এসে এসব সামগ্রী নিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সহায়তা সামগ্রীগুলো সাধারণত পরিবারের ব্যবহারের জন্য- এতে নারীর বিশেষ চাহিদা অনুসারে বেশি কিছু থাকেনা।
- যৌন নির্যাতনের শিকার হলে নির্যাতনকারীর পরিবর্তে নির্যাতিত নারীকেই অভিযুক্ত করা হয়। এরফলে নির্যাতিত নারী অনেক ভর্ৎসনা ও লাঞ্ছনা ভোগ করে।

৫.৬. নারীর কাজের মূল্যায়ন

নারী একই সাথে পুনরুৎপাদনমূলক কাজ (যেমন- সন্তান লালনপালন ও খাদ্য প্রস্তুত করা), উৎপাদনমূলক কাজ (যেমন- পশু পালন, বীজ সংরক্ষণ) ও বিভিন্ন সামাজিক কাজ (যেমন- সামাজিক সম্পর্কজাল) করে থাকে। বৈষম্য, বঞ্চনা ও সামাজিক প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে থেকেই তাকে এসব কাজ করতে হয়। এভাবেই সে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারার ক্ষমতা অর্জন করে ও দুর্যোগের সময় দ্রুত প্রথাগত দৈনন্দিন দায়িত্বের পাশাপাশি নতুন নতুন দায়িত্ব গ্রহণ করে। পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর সামর্থ্য ও প্রায়োগিক জ্ঞান সনাক্ত করা হয়না। নারীকে সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত গোষ্ঠী ও বোঝা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

সামাজিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজে নারীর ভূমিকার কথা বলা হলেও প্রাতিষ্ঠানিক কাজকর্মে এর খুব একটা প্রতিফলন দেখা যায়না। ঝুঁকি বিশ্লেষণে সাধারণত প্রথাগত পুনরুৎপাদনমূলক কাজে নারীর বাড়তি কষ্ট ও অনিরাপদ আশ্রয়, যৌন হয়রানি ও লিঙ্গভিত্তিক নির্যাতন বিবেচনা করা হয়। কখনো কখনো প্রাতিষ্ঠানিক কাজের কারণে নারীর দায়িত্বের বোঝা আরও বেড়ে যায়। সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কাঠামো এই দায়িত্বের বোঝাকে খুব সহজেই মেনে নেয় ও স্বীকৃতি দেয়। দুর্যোগ পরিস্থিতি ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে নারীর মুখ্য ভূমিকা সম্প্রসারণে যে সুযোগ সৃষ্টি করে তা খুব কমই ব্যবহার করা হয়। নারীর সক্ষমতা ও দক্ষতা সম্পর্কে কোন ধরণের যাচাই বা বিশ্লেষণ ছাড়াই প্রকল্প নির্ধারণ করে ও এভাবে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ায় নারীর ক্ষমতায়নের সুযোগ হারানোর পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ নষ্ট করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ঃ দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় নারীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠাকরণ

৬.১. নেতৃত্ব কার্যকর করার প্রক্রিয়া

জনগোষ্ঠীর বিপুল অংশ- জনসংখ্যার প্রায় তিন ভাগের দুই ভাগ হল নারী ও নারীর তত্ত্বাবধানে থাকা শিশু। জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস করতে হলে নারীর বিশেষ ঝুঁকিগুলো বিবেচনা করতে হবে। নারীর ঝুঁকি ও পুরুষের ঝুঁকি এক রকম নয়। নারীর ঝুঁকিগুলো ভালোভাবে না জেনে পরিকল্পনা করলে বা কার্যক্রম শুরু করলে তা খুব একটা কার্যকর হবেনা। নারীর সাথে প্রত্যক্ষভাবে যোগাযোগ না করে নারী ও পুরুষের ঝুঁকির এই ভিন্নতা এবং নারীর বিশেষ ও সুনির্দিষ্ট ঝুঁকির বিষয়ে সঠিকভাবে জানা যায়না। জনগোষ্ঠীর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছাড়াই অতীতে এদেশে অনেক উন্নয়ন কার্যক্রম চালানো হয়েছে। সেসব কার্যক্রম তেমন কোন সুফল বয়ে আনতে পারেনি। বাস্তব জীবনে বার বার দুর্যোগের মোকাবেলা করে নারী অনেক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করেছে- অনেক কলা কৌশল রপ্ত করেছে। এগুলো সে অর্জন করেছে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ব্যবহার করে। নারীর দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। তাই মূলধারার ঝুঁকিহ্রাস কৌশল থেকে নারীর ঝুঁকিহ্রাস কৌশল ভিন্ন হয়। এই ভিন্নতা সত্ত্বেও, নারী তার নিজস্ব কৌশল ব্যবহার করে দুর্যোগের বিভিন্ন পর্যায়ে নিজের ও পরিবারের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে পারে। সমাজে নারীর অধস্তন অবস্থানের কারণে নারীর এই অর্জন সকলের গোচরে আসেনা। নারীর এই অর্জনগুলো গোচরে আনলে ও এই জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলগুলো মূলধারায় ব্যবহার করতে পারলে দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম আরো বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে। দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীকে নেতৃত্বের ভূমিকায় নিয়ে আসতে পারলে নারীর জ্ঞান, দক্ষতা ও কৌশলগুলো মূলধারায় সম্পৃক্ত করা সম্ভব হবে। এরফলে, দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রম একদিকে যেমন আরো বেশি কার্যকর ও ফলপ্রসূ হবে, তেমনি অন্যদিকে নারীর প্রতি বৈষম্য কমানো ও নারীর অধিকারসমূহ রক্ষা করা সম্ভব হবে। আর এর জন্য দরকার হবে দুর্যোগে নারীর নিজস্ব সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ও তার বিশেষ চাহিদাগুলো গণনায় আনা, নারীর ঝুঁকিহ্রাস কৌশল বিবেচনা করা ও প্রাতিষ্ঠানিক কার্যপদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় কিছু পরিবর্তন আনা।

৬.২. প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রবর্তন

প্রাতিষ্ঠানিক দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রবর্তন করতে হলে নারীর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে হবে ও প্রক্রিয়াগত নিয়ন্ত্রণ পরিহার করে নারীকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ দিতে হবে।

৬.২.১. প্রবেশাধিকার

কাঠামো - দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমের সকল পর্যায়ে নারীর অংশগ্রহণ থাকা প্রয়োজন। তবে পর্যায়ভেদে প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ভিন্ন হতে পারে।

- গ্রাম পর্যায়ে বেসরকারি সংস্থা কর্তৃক ঝুঁকি বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় নারী জড়িত থাকে। এর মাধ্যমে নারী তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির আলোকে স্থানীয় আপদ ও দুর্যোগ ঝুঁকির ব্যাখ্যা তুলে ধরতে পারে।
- বর্তমান ব্যবস্থায়, নারী স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হতে পারে। এই কমিটির সদস্য হিসাবে সে দুর্যোগ প্রস্তুতি পরিকল্পনা প্রণয়নে ভূমিকা রাখে ও দুর্যোগ মোকাবেলায় অংশ নেয়।
- প্রতিরোধ ও প্রশমনে, বিশেষ করে, ভৌত কাঠামোগত প্রশমনের ক্ষেত্রে কন্সাল্টেশন মিটিং এর মাধ্যমে নারী মতামত ও পরামর্শ দেবার সুযোগ পেতে পারে। জরুরি ত্রাণ বিতরণ পরিকল্পনা করার সময়ও নারী তথ্য প্রদানকারী হিসাবে অংশ নেয়।

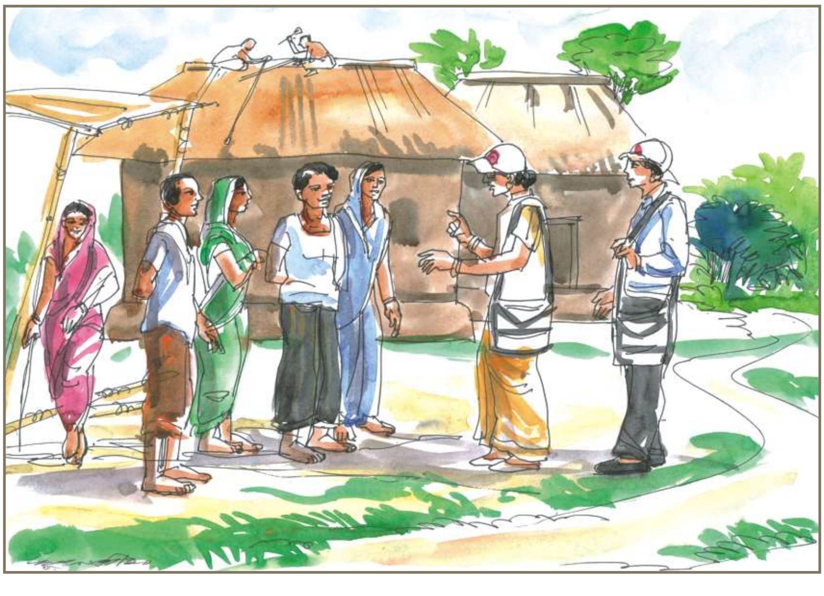

- দুর্যোগপ্রবণ এলাকায় নারী স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে কাজ করতে পারে।
- এছাড়াও, নারী বিশেষজ্ঞ হিসাবে বা ব্যবস্থাপক হিসাবে কাজ করতে পারে।

প্রক্রিয়া - নারীবান্ধব না হলে নারীর পক্ষে অংশগ্রহণ করা সম্ভব হয়না। নারীর ঘরসংসারের কাজ অনেক; তাকে এগুলো নিয়মিত ও সময়মত করতে হয়। কমিটি মিটিং, পরামর্শ সভা বা ঝুঁকি বিশ্লেষণের কাজগুলো যদি তার সুবিধামত সময়ে হয় তাহলে সে এতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। এছাড়া, সংস্থার নীতি ও পদ্ধতিগুলো যাচাই করে দেখতে হবে সেগুলো কতটা নারীবান্ধব; প্রয়োজনমত তাতে পরিবর্তন আনতে হবে।

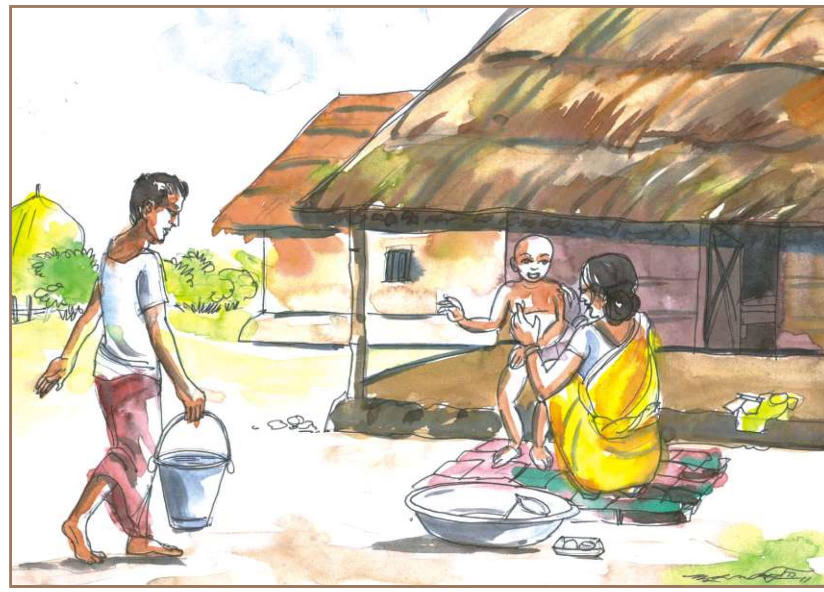

সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা- দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে অংশগ্রহণ যেন নারীকে কোন চাপের মধ্যে না ফেলে। সমাজের সবাই যেন মনে করে এটা নারীর জন্য একটা স্বাভাবিক কাজ। দরকার হলে গণ সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে যাতে এসব কাজে অংশগ্রহণ নারীর জন্য মর্যাদাপূর্ণ ও দরকারি বিষয় হিসাবে স্বীকৃতি পায়। আর সমাজ ও পরিবারের সবাই যেন এ বিষয়ে নারীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত থাকে।

তথ্য প্রবাহ - নাগালের মধ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি না পেলে নারী তার জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা বাড়াতে পারেনা। আর এর ফলে, তার পরামর্শ দুর্বল হয়ে পড়ে ও কার্যকারিতা হারায়। নারীর অংশগ্রহণ সুবাদে লাভবান হতে হলে সমকালীন তথ্য ও প্রযুক্তি নারীর নাগালে নিয়ে আসতে হবে। আর তা এমনভাবে করতে হবে যাতে এগুলো নারী বুঝতে পারে ও ব্যবহার করতে পারে।

৬.২.২. নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় - নারীর দৃষ্টিভঙ্গি পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ভিন্ন। সমস্যাগুলো সে তার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করে। নারীর পরামর্শ থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তার বিশ্লেষণ যাচাই করে দেখতে হবে। যেমন- বাঁধ বা ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ বিষয়ে নারীর অভিজ্ঞতা ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। ছোটখাটো বা প্রান্তিক বিষয়ে এই প্রয়াস নারীর প্রতি আস্থাহীনতা প্রকাশ করে।

মতামত বিবেচনা - নারীর মতামত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করতে হবে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে এই মতামতের প্রতিফলন থাকতে হবে। তা না হলে পুরো বিষয়টা একেবারে অর্থহীন পড়বে।

মত প্রকাশের স্বাধীনতা - নিয়ন্ত্রিত মতামত প্রকাশ বা লোক দেখানো অংশগ্রহণ কোন সুফল আনতে পারেনা। এখানে মূল বিষয় হল নারীর দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি দেখা ও নারীর অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মসূচিকে সমৃদ্ধ করা। আগে থেকেই ঠিক করা সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন আদায়ের জন্য নিয়ন্ত্রিত মতামত গ্রহণ কর্মসূচিকে খুব একটা সমৃদ্ধ করেনা।

নারীর ইচ্ছাধীন - নারী নিজেই সিদ্ধান্ত নেবে, সে এ ব্যাপারে জড়িত হবে কি হবে না, বা কতটা জড়িত হবে। জবরদস্তিমূলক বা চাপিয়ে দেওয়া অংশগ্রহণ নারীর উপর একটা অতিরিক্ত বোঝা। এতে নারীর মতামত ও পরামর্শ গুণগতভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে। এখানে কোন শর্ত থাকলে নারী সেই শর্ত পূরণের চেষ্টা করবে; সে নিজের মত বা ব্যাখ্যা প্রকাশ করবেনা।

৬.২.৩. তথ্য ও উপাত্ত

তথ্য ও উপাত্ত এমনভাবে সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করতে হবে যাতে নারী ও পুরুষের বিপদাপন্নতার পৃথক বিবরণ পাওয়া যায়। অনুরূপভাবে, নারী ও পুরুষ ভেদে ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদার পৃথক বিবরণ থাকতে হবে। যেমন- কতজন পুরুষ মারা গেছে, কতজন নারী মারা গেছে, কতজন পুরুষ আয়ের উৎস হারিয়েছে, কতজন নারী গৃহহারা হয়েছে, কতজন নারী পরিবার প্রধানের দায়িত্ব নিতে বাধ্য হয়েছে, পুরুষের চাহিদাগুলো কী এবং নারীর চাহিদাগুলো কী, ইত্যাদি।

৬.২.৪. লক্ষ্য নির্ধারণ

নারীর নিজস্ব সম্পদের ক্ষতি কমানো ও তার বিশেষ চাহিদা মেটানোর বিষয় বিবেচনা করে প্রকল্প বা কার্যক্রমের পৃথক উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা জরুরি। উদাহরণ স্বরূপ- নারীবান্ধব সতর্ক বার্তা প্রচার ব্যবস্থা, হাঁসমুরগির ক্ষতি কমানো, আপদ সহনীয় জলাধার নির্মাণ, ত্রাণ হিসাবে রান্নার সরঞ্জাম বিতরণ, জ্বালানী কাঠ বা সবজি বীজ বিতরণ ইত্যাদি। সমগ্র জনগোষ্ঠীর চাহিদা বিবেচনা করে প্রকল্প বা কার্যক্রমের লক্ষ্য নির্ধারণ করলে নারীর বিশেষ চাহিদা পূরণ করা বাস্তবক্ষেত্রে প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

৬.৩. সামাজিক পর্যায়ে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রবর্তন

প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি হল নারীর চিন্তাশক্তি দুর্বল ও তার বাস্তব জ্ঞান সীমিত। দুর্যোগের ঝুঁকি সে ঠিকমত বুঝতে পারেনা। তাছাড়া, সে শারীরিকভাবে দুর্বল। দুর্যোগকালে সে পুরুষের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল। প্রথাগত এই ধারণা পরিবর্তন করা বিশেষ জরুরি। কারণ, প্রকৃত অবস্থা হল এর বিপরীত। নারী দুর্যোগ ঝুঁকি সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল। এ নিয়ে সে চিন্তা করে ও ঝুঁকি প্রশমনের জন্য নিজস্ব কিছু কৌশল বের করে। নিয়ত প্রতিকূল অবস্থায় সীমিত সম্পদ নিয়ে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে হয় বলে নারী সহজাতভাবেই দুর্যোগ মোকাবেলা করার জন্য এইসব কৌশলগুলো বের করতে পারে।

প্রধানত গণ সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রচলিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন আনা যেতে পারে। আর এই সচেতনতা বৃদ্ধি হতে পারে দু'ভাবে। ১) জনশিক্ষা, যেমন- গ্রাম বৈঠক, উঠান বৈঠক, সমাজ ভিত্তিক ঝুঁকি বিশ্লেষণ, গণনাট্য ইত্যাদি; ২) সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ভিত্তিক প্রকল্প বাস্তবায়ন করা, যেমন- মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুর জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা সৃষ্টি বা দুর্যোগ সহনীয় সবজি চাষ।

৬.৩.১. দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন

সামাজিক প্রথাগুলো যে একেবারেই অনড় ও অপরিবর্তনীয় তা নয়। কালক্রমে বা প্রয়োজন অনুযায়ী এর পরিবর্তন হয়। সুতরাং, নারীবান্ধব লক্ষ্য ভিত্তিক প্রকল্প বা কার্যক্রমের মাধ্যমে বৈষম্যমূলক প্রথাসমূহে পরিবর্তন আনার সুযোগ আছে।

নারীর দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস ও আয়মূলক কাজ সম্পর্কে সামাজিক বিধিনিষেধ ও ধারণায় সম্প্রতি কিছু পরিবর্তন এসেছে। যেমন-

- নারীর অনেক কাজ এখন ঝুঁকিহ্রাসমূলক কাজ হিসাবে ধরা হয়। যেমন- আলগা চুলা বানানো, জ্বালানি সংগ্রহ করে রাখা, শুকনো খাবার জমিয়ে রাখা, বা পাড়াপড়শির সাথে সামাজিক লেনদেনের সম্পর্ক গড়ে তোলা। দুর্যোগ পরিস্থিতিতে নারী পরিবারের সবার জন্য পানি ও খাবারের যোগান দেয়। তদুপরি, দুর্যোগকালে পরিবারের পুরুষ সদস্য আহত, নিহত বা নিখোঁজ হলে, বা পুরুষ সদস্য আয়রোজগারের জন্য অন্যত্র চলে গেলে নারী সহজাতভাবে পরিবার প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- জীবিকা ও আয়মূলক কাজে নারীর অংশগ্রহণে সামাজিক বিধিনিষেধ এখন অনেক শিথিল। নারী বরাবরই শাকসবজি লাগানো ও হাঁসমুরগি বা গরুছাগল পালনে জড়িত ছিল; আজকাল তারা দিনমজুর হিসাবে কৃষিকাজে অংশ নেয়, মাটি কাটার কাজ করে, ইটখোলায় কাজ করে বা শহরে গৃহনির্মাণ কাজে যোগ দেয়।
- স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নারীরা অংশগ্রহণ করে। তবে, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির ভূমিকা শুধুমাত্র পূর্বপ্রস্তুতি ও দুর্যোগকালীন ক্ষয়ক্ষতি নিরসন কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ; দুর্যোগ পরবর্তী অর্থনৈতিক পুনর্বাসনে এর কোন ভূমিকা নাই।

৬.৩.২. জনশিক্ষা

সামাজিক বৈষম্য, নারীর ঝুঁকি ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাসে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রবর্তনে জনশিক্ষা কেন্দ্রীয় বিষয় হতে পারে। যেমন-

- দুর্যোগের সময়ে পরিবারের মর্যাদা রক্ষার চেয়ে জীবন রক্ষা বেশি জরুরি;
- নারীর উপর আরোপিত বিধি নিষেধ পুরো পরিবারকে ঝুঁকিগ্রস্ত করে;

- দুর্যোগে নারীই সর্ব প্রথম সাড়া দেয়;
- প্রথাগত সামাজিকীকরণ জীবনহানির ঝুঁকি বাড়ায়;
- নারীর নিজস্ব সম্পদ দুর্যোগ কালে পরিবারকে রক্ষা করে;
- দুর্যোগের সময় পুরুষের আয় থাকেনা, নারী পরিবারের বোঝা বহন করে;

৬.৩.৩. প্রদর্শনমুখি প্রকল্প

নারী ও পুরুষের সামাজিক শ্রম বিভাজন সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ভিত্তিক প্রকল্পের প্রধান বিষয় হতে পারে। যেমন-

- স্কুল ভিত্তিক বা স্থানীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে মেয়েশিশু ও ছেলেশিশুর জীবন রক্ষাকারী দক্ষতা সৃষ্টি;
- দুর্যোগ সহিষ্ণু বা দ্রুত বর্ধনশীল সবজি বাগান;
- ত্রাণ সহায়তা হিসাবে সবজি বীজ বিতরণ;
- ত্রাণ সহায়তা হিসাবে হাঁস মুরগি বিতরণ;
- 'টাকার-বিনিময়ে-কাজ' এর মাধ্যমে গৃহস্থালি কাজ করা (পুরুষ এই প্রকল্পের উপকারভোগী হতে পারে);
- ত্রাণ সহায়তা হিসাবে রান্নার সরঞ্জাম (দা ও বটি সহ) ও জ্বালানী বিতরণ;
- সমাজ ভিত্তিক ও অংশগ্রহণমূলক প্রক্রিয়ায় স্থানীয় জনগোষ্ঠীর আচরণবিধি নির্মাণ (ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনের জন্য নিয়োগকর্তাদের আচরণবিধির অনুরূপ);

দুর্যোগ সংক্রান্ত অনেক কাজে নারী এখন অংশ নেয়। সে কমিটির সদস্য হয়; ঝুঁকি বিশ্লেষণে যোগ দেয়; স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে কাজ করে। তবে, শুধুমাত্র নারীর বিপদাপন্নতা কমানোর জন্য ঝুঁকিহ্রাস কার্যক্রমে তার উপস্থিতি যথেষ্ট নয়। অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে হলে নারীর অবদানগুলো স্বীকার করতে হবে ও ঝুঁকিহ্রাসে নারীর মুখ্য ভূমিকা প্রতিষ্ঠা ও প্রসার করতে হবে। এ সংক্রান্ত কাজগুলো প্রথাগত শ্রম বিভাজনের ধারণায় পরিবর্তন আনতে ও নারীর প্রতি বৈষম্য কমাতে সাহায্য করবে। নারীর ভূমিকা প্রকৃতভাবে মূল্যায়ন করবে ও দুর্যোগ ঝুঁকিহ্রাস কাঠামোতে বড় ধরণের পরিবর্তন আনবে। আর, এটি নারীসহ সমগ্র জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি কমাতে সহায়ক হবে। কোন সংস্থার পক্ষে এককভাবে এটি করা খুবই কঠিন। এর জন্য দরকার সকলের সমন্বিত প্রয়াস। যেকোনো সংস্থা এটি সূচনা করতে পারে।

পরিভাষা

জবাবদিহিতা: 'জবাবদিহিতা' বলতে বোঝায় কিভাবে একটি সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কার্যক্রমে বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাহিদার প্রতিফলন ঘটায়। অধিকাংশ এনজিও'র বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী যেমন- দাতা সংস্থা অথবা সংশ্লিষ্ট সরকারের কাছে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া আছে।

অভিযোজন: অভিযোজন হচ্ছে প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ও ফলাফলের সাথে খাপ খাইয়ে নেয়া যায় এবং স্থানীয় জ্ঞান ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা যায়।

সক্ষমতা: কোন দুর্যোগে আক্রান্ত ব্যক্তি, পরিবার বা জনগোষ্ঠীর ঐ দুর্যোগ মোকাবেলা করার যোগ্যতা বা সামর্থ্যকেই সক্ষমতা বলে।

দুর্যোগ: দুর্যোগ এমন এক প্রাকৃতিক বা মানবসৃষ্ট অনাকাঙ্খিত অবস্থা যা হঠাৎ কিংবা ধীরে ধীরে ঘটে এবং একটি নির্দিষ্ট এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর জান, মাল, পরিবেশ, প্রাত্যহিক জীবিকা ও মনোজগতের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানে এবং মানুষকে এমন অসহায় করে তোলে যা কাটিয়ে উঠার জন্য অন্যের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে।

দুর্যোগ প্রস্তুতি: দুর্যোগ প্রস্তুতি হলো একটি দুর্যোগের ঘটনাকে অনুমান করে, দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে কার্যক্রম গ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য পূর্ব থেকে ব্যবস্থা গ্রহণ করা।

দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা: দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা হচ্ছে একটি বিশেষ ধরণের জরুরী ব্যবস্থাপনা যাতে দুর্যোগের প্রতি পর্যায়ে নীতি নির্ধারণ, প্রশাসনিক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তব পদক্ষেপ অন্তর্ভূক্ত।

দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস: একটি সমাজের বিপদাপন্নতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসের কাঠামোগত ধারণা হলো দুর্যোগের প্রতিকূল প্রভাব সীমিত (প্রশমন ও প্রস্তুতি) বা পরিহার (প্রতিরোধ) করা, যা বৃহদ্বার্থে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নের অংশ।

জেন্ডার: নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্ক হচ্ছে জেন্ডার যা সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারে নারীসুলভ বা পুরুষসুলভ দায়িত্ব, কর্তব্য, সম্পর্ক এবং নারী-পুরুষের পরিচিতি নির্ধারণ করে দেয়।

জেন্ডার প্রবেশগম্যতা: সম্পদ, সুযোগ-সুবিধাদি, সেবা, তহবিল, লাভ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রবেশগম্যতাকে বোঝায়। এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট এলাকার সুনির্দিষ্ট সময়ের প্রথা ও ধ্যান-ধারণার কারণে সম্পদ ব্যবহার এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারী-পুরুষের বৈষম্যকে প্রকাশ করে।

জেন্ডার বৈষম্য : সমাজে সৃষ্ট জেন্ডারভিত্তিক ভূমিকা ও প্রথার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভেদ, বিচ্ছিন্নতা অথবা বাধাসমূহ যা মানুষকে মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

জেন্ডারভিত্তিক শ্রমবিভাজন: বাসায়, কর্মক্ষেত্রে এবং সমাজে নারী ও পুরুষের কাজ এবং দায়িত্ব নির্ধারণ করে দেয়। কাজের ধরণ অনুসারে বিবেচনা করে সমাজ এমনভাবে শ্রমবিভাজন করে যা সুনির্দিষ্ট স্থান এবং সময়ের সাথে সমন্বয়কৃত।

জেন্ডার সমতা: যে ধরণের ধ্যান-ধারণায় প্রচলিত ধারা, সীমাবদ্ধ জেন্ডার ভূমিকা ও সংস্কার সংশ্লিষ্ট বাধা-বিঘ্ন ছাড়াই নারী ও পুরুষ স্বাধীনভাবে ব্যক্তিগত সাফল্য অর্জন করতে পারে তাকে জেন্ডার সমতা বলা হয়। জেন্ডার সমতা বলতে বোঝায় সকল মানুষ স্বাধীনভাবে তাদের অধিকার অনুধাবন করে দেশ, জাতি, অর্থনীতি, সমাজ এবং সংস্কৃতির উন্নয়নে অবদান রাখবে এবং সমানভাবে লাভবান হবে। এর অর্থ এই নয় যে নারী ও পুরুষ এক হয়ে যেতে হবে বা নারী-পুরুষ নামের ওপর বিবেচনা করে দায়িত্ব ও কর্তব্য নিধারণ করতে হবে।

জেন্ডার পার্থক্য: নারী ও পুরুষের সামাজিক পার্থক্য।

জেন্ডারকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করা: এটা এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সকল স্তরের নীতি ও কার্যক্রমের পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ এবং মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় নারী-পুরুষ উভয়েরই মতামত ও অভিজ্ঞতাকে সমানভাবে বিবেচনা করা হয় যেন সকলে সমান সুবিধা গ্রহণ করতে পারে এবং কোনভাবেই কোনরকম অসমতা সৃষ্টি না হয়।

জেন্ডার ভূমিকা: সুনির্দিষ্ট এলাকা এবং যুগের নারী ও পুরুষরা প্রচলিত প্রথা ও ধ্যান-ধারণা অনুসারে কিভাবে দায়িত্ব পালন করে, চিন্তা এবং আত্মস্থ করে তা জেন্ডার ভূমিকা দ্বারা প্রকাশিত হয়।

কাজের জেন্ডারভিত্তিক মূল্যায়ন: এর মাধ্যমে নারী ও পুরুষের বিভিন্ন কাজ এবং দায়িত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ধ্যান-ধারণাকে নির্দেশ করা হয়।

আপদ: 'আপদ' সাধারণতঃ 'সম্ভাব্য' অর্থে ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ, এমন একটা সম্ভাব্য অস্বাভাবিক ঘটনা যা প্রাকৃতিক, মানবসৃষ্ট বা কারিগরী ক্রুটির কারণে ঘটতে পারে এবং যা মানুষের স্বাভাবিক জীবন-জীবিকা ও পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করতে পারে।

মানবিকতা: মানবিকতাবাদ হল দয়া, মঙ্গলকরণ এবং সকল মানুষের জন্য সর্বজনীনভাবে সহানুভূতির হাত প্রসারিত করার জীবন দর্শন। দেশ ভাগ, লিঙ্গগত, উপজাতি, জাতিগত ও ধর্মীয় বিচ্ছেদের ফলে মানুষের যে দুর্ভোগ হয় তাতে কোন পাথর্ক্য নেই।

নেতৃত্ব: নেতৃত্ব এমনই একটি প্রক্রিয়া যা কোন একটি সমাজ বা সংগঠনকে কাঙ্খিত লক্ষ্যে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। নেতা স্বীয় সমাজ বা সংগঠনের চিন্তা চেতনা ও অনুভূতিকে ধারণ করেন, প্রভাবিত করেন ও পরিচালিত করেন। নেতাকে স্বীয় সমাজ বা সংগঠনের প্রতিভূ, প্রতিনিধি ও মূখপাত্র নামে অভিহিত করেন।

প্রশমন: প্রশমনমূলক কার্যক্রম বলতে সেই সকল কার্যক্রমের সমষ্টিকে বোঝায় যা প্রাকৃতিক আপদ, পরিবেশগত বিপর্যয় এবং প্রযুক্তিগত আপদ থেকে উদ্ভূত প্রতিকূল প্রভাব দূর করতে সহায়ক।

পুনরুদ্ধার: পুনরুদ্ধার হলো দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রম যা জনগোষ্ঠীকে পুনর্নির্মান/পুনর্গঠনের মাধ্যমে দুর্যোগের ক্ষতি কাটিয়ে উঠতে সহায়তা করে।

অধিকার: অধিকার বলতে মানুষের আত্মবিকাশের জন্য কতিপয় সুযোগ সুবিধার দাবীকে বোঝায়, যে দাবী হয় নৈতিক না হয় আইনগত ভিত্তি রয়েছে।

সাড়া প্রদান: আপদের চিহ্নিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা করতে সকল প্রচেষ্টা নেওয়ার পরও অনেক সময় দুর্যোগ এড়ানো সম্ভব হয় না। ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সময়ে তা বিবেচনায় নিয়ে জরুরি অবস্থা মোকাবিলার জন্য প্রস্তুত থাকা এবং দুর্যোগে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীকে জরুরি পরিস্থিতিতে কার্যকর সহায়তা দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট সংস্থা, জনগোষ্ঠী এবং ব্যবস্থাকে সচল রাখাই হলো দুর্যোগে জরুরি সাড়া।

ঝুঁকি: কোন আপদে বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠীর সম্পদ, আয় ও পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাবের কারণে ক্ষতির আশঙ্কাই হলো ঝুঁকি। স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে একই দুর্যোগের ঝুঁকি এক একজনের জন্য এক এক রকম অর্থাৎ, কম বেশি হতে পারে।

ঝুঁকি নিরূপণ: জনগোষ্ঠীর দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ একটি অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতি যার অনুশীলনের মাধ্যমে একটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর আপদ, ঝুঁকি, বিপদাপন্নতা, ঝুঁকি মানিয়ে নেবার ক্ষমতা ও তা সাফল্যের সাথে আয়ত্ব করার কৌশল এবং ঝুঁকি নিরসনে কার্যকর পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

ঝুঁকি স্থানান্তর: ঝুঁকি স্থানান্তর বলতে বোঝায় এক প্রকার চুক্তি বা সম্ভাব্য প্রতিরোধ ব্যবস্থা যার মাধ্যমে অন্য দিকে ঝুঁকির দিক পরিবর্তন করে দেয়া যেতে পারে।

জেন্ডারভিত্তিক কৌশলগত চাহিদা: নারীর ক্ষমতায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট যা ক্ষমতা এবং নিয়ন্ত্রয়ণের ক্ষেত্রে সমতাভিত্তিক জেন্ডার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন। জেন্ডারভিত্তিক কৌশলগত চাহিদা জন্ম হয় প্রচলিত জেন্ডার ভূমিকা এবং সম্পর্ককে চ্যালেঞ্জ করে ।

বিপদাপন্নতা: বিপদাপন্নতা বলতে কোন ব্যক্তি, পরিবার কিংবা জনগোষ্ঠীর কোন এক বা একাধিক সুনির্দিষ্ট আপদে আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা এবং ঐ আপদ সংঘটনের ফলে ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষয়ক্ষতির সম্ভাব্য মাত্রাকে বোঝায়। অর্থাৎ, বিপদাপন্নতা বলতে কোন নির্দিষ্ট বিপদের মাত্রা ও তা মোকাবেলার ক্ষমতার অনুপাতকে বোঝায়।

তথ্যসূত্র

ActionAid International, Women's rights in emergencies, Integrating Women's Rights into emergency response: a guide for trainers, 2009

Akhter, Gender Analysis Framework, Oxfam GB, Bangladesh Programme.

Alam. K., Comparative Risk Profile in Climate Change of the Selected Agro-ecological zones in Bangladesh, An Assessment and outline of DRR strategy for Oxfam-GB, Bangladesh, 2009

Alam et. al., Gender, climate change and human security in Bangladesh,2008

Alam. k., Methodology for women livelihood and climate change study in South Asia- Understanding what women want to spend AF fund to adapt their livelihood with climate change impact, 2007

British Columbia, Women in Disasters, conference proceedings and recommendations, seminar on exploring the issues,1998

Charlotte et. al., Addressing the Needs of Women Affected by Armed Conflict, 2004

DFID, Gender Manual: A Practical Guide for Development Policy Makers and Practitioners, 2002

DMIC, DMB, Summary of Cyclone SIDR Response, 2007

Enarson, E., Promoting Gender Justice in Disaster Reconstruction: Guidelines for Gender-Sensitive and Community-based Planning, DMI Ahmedabad, 2001

Enarson et. al., Working with Women at Risk- Practical Guidelines for Assessing Local Disaster Risk, International Hurricane Center, Florida International University, 2003.

FERENCIC P. D., Disaster Management, Women: An Asset or a Liability?, International Research and Training Institute for the Advancement of Woman (INSTRAW)

GDN, Gender Equality in Disasters Six Principles for Engendered Relief and Reconstruction

ELIAMEP, Gender, Climate Change and Human Security Lessons from Bangladesh, Ghana and Senegal, 2008

Hussain, Z., Humanitarian response in crisis of low intensity caused by natural events in the context of Bangladesh, 2004

IASC, Guidelines for Gender-based Violence Interventions in Humanitarian Settings- Focusing on Prevention of and Response to Sexual Violence in Emergencies, 2005

IASC , The Basics on Gender in Emergencies, Different Needs – Equal Opportunities

IASC, Women, Girls, Boys and men different needs – Equal Opportunities, 2006

InfoResources Focus, Disaster Risk Reduction: A Gender and Livelihood Perspective

ISDR, Gender Perspective: Working Together for Disaster Risk Reduction Good Practices and Lessons Learned, 2007

UNDP, ADPC et. al. Integrating Gender into Community Based Disaster Risk Management Training Manual

Mehta. M., Disasters & Vulnerable Groups: En-Gendering Disaster Preparedness, Ph.D. Paper presented at International Symposium on Geo-disasters, Infrastructure Management and Protection of World Heritage Sites, Kathmandu, Nepal, 2006

MIUSA & USAID, The Checklist for Inclusion, Building an Inclusive Development Community: A Manual on Including People with Disabilities in International Development Programs

MoEF, Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan, 2009

Oxfam Emergency Managers Network, Gender in Emergencies sub-group, Handbook Gender Equality and Women's Rights in Emergencies, 2010

Oxfam-GB Emergencies Department, A Little Gender Handbook for Emergencies or Just Plain Common Sense

Oxfam-GB Standards and Indicators for Gender & Protection

Pakistan flood, ABC of gender sensitive response, 2010

Pakistan Floods, Preliminary rapid gender assessment of Pakistan's flood crisis, UNIFEM, 2010

Pincha. C., Gender Sensitive Disaster Management- A Toolkit for Practitioners, Earthworm Books for Oxfam America and NANBAN Trust, 2008

ProVention Consortium, Flood disasters, Learning from previous relief and recovery operations

PLT, Putting Poor Women's Rights at the Heart of our Programme, 2010

UNISDR, UNDP and IUCN, Making Disaster Risk Reduction Gender-Sensitive Policy and Practical Guidelines, Geneva, Switzerland, 2009

UNDP, Resource Guide on Gender And Climate Change, 2009

UNDP, Power, Voice and Rights- A Turning Point for Gender Equality in Asia and the Pacific, 2010

Unicef , Women and Girls in Bangladesh

UN, Women 2000 and Beyond - Making Risky Environments Safer, Division for the Advancement of Women, 2004

অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ প্রোগ্রাম, দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ২০০৬

অক্সফাম-জিবি বাংলাদেশ, দুর্যোগে আমরা প্রস্তুত, ২০১০

নাসরীন, এম. ও অন্যান্য, পরিবেশ সমাজবিজ্ঞান, তপন প্রকাশন, ২০০৮

নেটওয়ার্ক অন ক্লাইমেট চেঞ্জ, প্রশিক্ষণ সহায়িকা, ২০০৯

মোঃ নুরুল হুদা, দ্রুত পুনরুদ্ধার বিষয়ক প্রশিক্ষণ সহায়িকা, আরডিআরএস বাংলাদেশ, ২০১০

মোঃ নুরুল হুদা, দ্রুত জরুরি চাহিদা নিরূপণ এবং ক্ষয়ক্ষতি নিরূপণের প্রশিক্ষণ সহায়িকা, আরডিআরএস বাংলাদেশ, ২০১০

সিডিএমপি, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, দুর্যোগকোষ, ২০০৯

পটগান

জরুরি পরিস্থিতিতে সহায়তা পাওয়া ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের অধিকার। আর ত্রাণ কার্যক্রম পরিচালনার সময় জবাবদিহিতার মূলনীতিগুলো মেনে চলা জরুরি। জরুরি ত্রাণ কার্যক্রমে জবাবদিহিতার বিষয়টিকে উপজীব্য করে অক্সফাম-জিবি'র সহায়তায় রূপান্তর তৈরি করেছে 'পটগান' যেখানে জনপ্রিয় লোকমাধ্যম ব্যবহার করে বিষয়গুলো উপস্থাপন করা হয়েছে। "জরুরি ত্রাণ কার্যক্রমে জবাবদিহিতা" বিষয়ক পটগান সিডি'তে অন্তর্ভূক্ত করা হল।